HSC
একাডেমিক কোর্স

পৌরনীতি ও সুশাসন ২য় পত্র

অধ্যায়ঃ ১০ – নাগরিক সমস্যা ও আমাদের করণীয়

টপিক – ০১ নাগরিক সমস্যা ও আমাদের করণীয়

আলোচিত বিষয়বস্তু

টপিক ০১: বিশেষ চাহিদার জনগোষ্ঠীঃ প্রতিবন্ধী
টপিক ০২: দুর্নীতি
টপিক ০৩: খাদ্যে ভেজাল
টপিক ০৪: ইভ টিজিং
টপিক ০৫: জলবায়ু পরিবর্তনজনিত সমস্যা
টপিক ০৬: এইডস
টপিক ০৭: বহুনির্বাচনী প্রশ্ন সমাধান
টপিক ০৮: সৃজনশীল প্রশ্ন সমাধান

টপিক ০১: বিশেষ চাহিদার জনগোষ্ঠীঃ প্রতিবন্ধী

This Topic is important for

MCQ	সৃজনশীল	
	ক	খ
	গ	ঘ

বিশেষ চাহিদার জনগোষ্ঠীঃ প্রতিবন্ধী

একটি সমাজ বা রাষ্ট্রে যারা স্বাভাবিক নিয়মে তাদের যাবতীয় চাহিদা পূরণ করতে পারে, স্বাভাবিক সুস্থ জীবনযাপন করতে পারে তাদেরকে আমরা স্বাভাবিক মানুষ বলে থাকি। কিন্তু যারা এভাবে স্বাভাবিক জীবনযাপন করতে পারে না, নিজেদের চাহিদা নিজেরা পূরণ করতে পারে না, তাদের বলা হয় 'বিশেষ চাহিদার জনগোষ্ঠী'। এই 'বিশেষ চাহিদার জনগোষ্ঠীর' মধ্যে অন্যতম হলো 'প্রতিবন্ধী'। জাতিসংঘ পরিচালিত সমীক্ষায় বলা হয়েছে যে বিশ্ব জনসংখ্যার প্রায় ১০% মানুষ কোনো-না-কোনোভাবে প্রতিবন্ধী।

বিশেষ চাহিদার জনগোষ্ঠীঃ প্রতিবন্ধী

প্রতিবন্ধীর ধারণা ও অর্থ

শারীরিক যোগ্যতার ভিত্তিতে পৃথিবীতে দুই ধরনের মানুষ দেখতে পাওয়া যায়। এক ধরনের মানুষ নিখুত দেহ বৈশিষ্ট্যের অধিকারী, অন্য এক ধরনের মানুষ রয়েছে যারা দেহগত দিক থেকে ত্রুটিপূর্ণ। এ শ্রেণির মানুষকে বলা হয় প্রতিবন্ধী (Handicapped) ।

'উইকিপিডিয়ায়' প্রতিবন্ধিত্বের সংজ্ঞা দিতে গিয়ে বলা হয়েছে যে, "বয়স, লিঙ্গ, জাতি, সংস্কৃতি বা সামাজিক অবস্থান অনুযায়ী আর দশজন যে কাজগুলো করতে পারে ইমপেয়ারমেন্টের কারণে সে কাজগুলো প্রাত্যহিক জীবনে করতে না পারার অবস্থাটাই হলো ডিসএবিলিটি বা প্রতিবন্ধিতা।"

'বাংলাদেশ প্রতিবন্ধী কল্যাণ আইন, ২০০১'-এ বলা হয়েছে যে, "প্রতিবন্ধী অর্থ এমন ব্যক্তি যিনি জন্মগতভাবে বা রোগাক্রান্ত হয়ে বা দুর্ঘটনায় আহত হয়ে বা অপচিকিৎসায় বা অন্য কোনো কারণে দৈহিকভাবে বিকলাঙ্গ বা মানসিকভাবে ভারসাম্যহীন এবং উক্তরূপ বৈকল্য বা ভারসাম্যহীনতার ফলে স্থায়ীভাবে আংশিক বা সম্পূর্ণ কর্মক্ষমতাহীন এবং স্বাভাবিক জীবনযাপনে অক্ষম।"

বিশেষ চাহিদার জনগোষ্ঠীঃ প্রতিবন্ধী

প্রতিবন্ধীর ধারণা ও অর্থ

'বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা' (WHO) প্রকাশিত "International classification of Impairment, Disability and Handicapped (ICIDH)" শীর্ষক প্রকাশনায় বিকলাঙ্গ ও প্রতিবন্ধী সমস্যাকে তিন শ্রেণিতে বিভক্ত করা হয়েছে, যথা- ১. Impairment (দূর্বলতা), ২. Disability (অক্ষমতা), ৩. Handicap (প্রতিবন্ধী)।

ইউনিসেফ (UNICEF) প্রতিবন্ধকতাকে 'অক্ষমতা' (Disability) এবং 'বিকলাঙ্গতা' (Handicap) নামক দুটি প্রত্যয়ের মাধ্যমে সংজ্ঞায়িত করার বা ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করেছে।

ইউনিসেফ প্রদত্ত সংজ্ঞানুযায়ী 'প্রতিবন্ধীতা হলো শারীরিক বা মানসিক ক্ষতির কারণে উদ্ভূত এমন কোনো বাধা বা সীমাবদ্ধতা যা একজন মানুষের স্বাভাবিক কাজকর্মকে পূর্ণভাবে ব্যাহত করে' (Handicap is a disability has interfared with the development of ability to do what is normally expected at a certain stage.) ।

বিশেষ চাহিদার জনগোষ্ঠীঃ প্রতিবন্ধী

প্রতিবন্ধীর ধারণা ও অর্থ

ইউনিসেফ 'অক্ষমতা' (Disability) অর্থে প্রতিবন্ধীর সংজ্ঞা দিতে গিয়ে বলেছে "প্রতিবন্ধী হলো সেসব অসুবিধা যা মানুষের দৃষ্টিশক্তি, বাকশক্তি, শ্রবণশক্তি, লিখন শক্তি, চলাফেরার শক্তি, বোধ শক্তি বা অন্য কোনো কার্যক্রম যা মানুষের স্বাভাবিক জীবনযাপনকে ব্যহত করে' ('Disability is the difficulty in seeing, speaking, hearing, writing, walking, conceptualizing or in any other function within the range considered normal for a human being.') ।

জাতিসংঘের 'আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থা' (ILO) প্রদত্ত সংজ্ঞানুযায়ী 'একজন প্রতিবন্ধী হচ্ছেন তিনি যার স্বীকৃত শারীরিক ও মানসিক ক্ষতিগ্রস্ততার কারণে যথোপযুক্ত কর্মসংস্থানের প্রত্যাশা কমে যায়'।

সুতরাং উপরের আলোচনার আলোকে বলা যায় যে, যারা দৈহিক, মানসিক ও বুদ্ধিবৃত্তিক ক্ষতির কারণে সমাজে প্রত্যাশিত ভূমিকা পালনে অক্ষম, তারাই প্রতিবন্ধী।

বিশেষ চাহিদার জনগোষ্ঠীঃ প্রতিবন্ধী

প্রতিবন্ধিতার প্রকারভেদ

নিম্নে কয়েকটি ভিত্তি বা মাপকাঠিতে প্রতিবন্ধিতার প্রকারভেদ করা যেতে পারে:

১. প্রতিবন্ধিত্ব শুরুর সময়কাল বিবেচনা করে প্রতিবন্ধী দুই ধরনের; যেমন- যারা প্রতিবন্ধিত্ব নিয়েই জন্মগ্রহণ করে তাদেরকে 'প্রাথমিক প্রতিবন্ধী' বা 'জন্মগত প্রতিবন্ধী' বলা হয়। অপরদিকে জন্মের পর বিভিন্ন কারণে যারা প্রতিবন্ধিত্ব বরণ করে তাদেরকে 'অর্জিত প্রতিবন্ধী' বলা হয়।

২. শরীরের বিশেষ কোনো অঙ্গহানি বা আক্রান্ত হবার ভিত্তিতে প্রতিবন্ধী হয় কয়েক রকমের; যথা-

(ক) শারীরিক প্রতিবন্ধী, (খ) দৃষ্টি প্রতিবন্ধী, (গ) শ্রবণ প্রতিবন্ধী, (ঘ) বাক্ প্রতিবন্ধী, (ঙ) বুদ্ধি প্রতিবন্ধী, (চ) মানসিক প্রতিবন্ধী, (ছ) সামাজিক প্রতিবন্ধী, (জ) বহুমুখী প্রতিবন্ধী।

বিশেষ চাহিদার জনগোষ্ঠীঃ প্রতিবন্ধী

প্রতিবন্ধীর কারণ

মানুষ প্রতিবন্ধী হয় যে সব কারণে তা নিম্নরূপ:

১. রক্তের সম্পর্ক রয়েছে এমন কাউকে বিয়ে করলে তাদের সন্তান-সন্ততি,

২. উচ্চ মাত্রায় জ্বরের কারণে,

৩. মস্তিষ্কের কিছু কিছু ইনফেকশন বা টিউমার হবার কারণে,

৪. গর্ভাবস্থায় মায়ের পুষ্টির অভাব ঘটলে,

৫. জন্মের পর থেকে মা ও শিশুর পুষ্টির অভাব ঘটলে,

৬. ভিটামিনের অভাবে,

৭. আয়োডিনের অভাবে,

৮. গর্ভাবস্থায় প্রথম তিন মাসের মধ্যে মা কোনো ধরনের কড়া ওষুধ গ্রহণ করলে, অথবা কীটনাশক, রাসায়নিক দ্রব্য খেয়ে ফেললে বা রশ্মি, বিষক্রিয়া গ্রহণ করে থাকলে,

বিশেষ চাহিদার জনগোষ্ঠীঃ প্রতিবন্ধী

প্রতিবন্ধীর কারণ

৯. গর্ভাবস্থায় মায়ের বিশেষ হাম হলে,
১০. গর্ভধারিণী মায়ের হৃদযন্ত্র সংক্রান্ত জটিলতা বা ডায়াবেটিস থাকলে,
১১. গর্ভধারিণী মায়ের মদপান, ধূমপান বা তামাকপাতা ব্যবহারের অভ্যাস বা আসক্তি থাকলে,
১২. অপ্রশিক্ষিত ধাত্রী বা ডাক্তারের দ্বারা প্রসব করানোর কারণে নবজাত শিশু মাথায় আঘাত প্রাপ্ত হলে,
১৩. জন্মের সময় প্রয়োজনীয় অক্সিজেনের অভাব দেখা দিলে,
১৪. দুর্ঘটনার কারণে,
১৫. পঙ্গুত্ব নিয়েই জন্ম গ্রহণ করলে,
১৬. পোলিও, টাইফয়েড, নিউমোনিয়া, রিকেটস ইত্যাদি রোগের কারণে।

বিশেষ চাহিদার জনগোষ্ঠীঃ প্রতিবন্ধী

প্রতিবন্ধীজনিত সমস্যা

যে দেহ ও মনের সাহায্যে মানুষ কর্মতৎপর হয়, তা যদি বিকল হয় তাহলে মানবজীবনে নেমে আসে হতাশার অমানিশা। অনেকে এ জন্য প্রতিবন্ধী জীবনকে অভিশাপগ্রস্ত বলে ভাবেন। প্রতিবন্ধীরা হতাশায় নিমজ্জিত হন। এ সব প্রতিবন্ধীদের অনেকেই চোখ দিয়ে দেখতে পায়, স্নায়ু দ্বারা অনুভবও করতে পারে, কিন্তু তা উপলব্ধি ও বিশ্লেষণ করতে পারে না। কোনো সৃজনশীল চিন্তাভাবনা করার ক্ষমতা তাদের থাকে না। ধীরে ধীরে তারা আরও মানসিক প্রতিবন্ধী হয়ে পড়ে। অন্যদিকে অন্ধ প্রতিবন্ধীদের জীবন আরও করুণ এবং দুর্বিষহ। তারা রূপ-রস-গন্ধ ভরা এ পৃথিবীর কোনো সৌন্দর্যই দেখতে পায় না, উপভোগ করতে পারে না। তারা সারাটা জীবন অন্যের ওপর নির্ভরশীল হয়ে বেঁচে থাকে। একসময় যখন তাদের বাবা-মা এ পৃথিবী ছেড়ে চলে যান তখন এ প্রতিবন্ধীরা আরো অসহায় হয়ে পড়েন। মুক, বধির ও বিকলাঙ্গ প্রতিবন্ধীরা পৃথিবীর সব কিছু দেখতে পেলেও সেগুলো সম্পর্কে তাদের অনুভূতি প্রকাশ করতে পারে না বা সেগুলোর সাথে একাত্ম হতে পারে না। দুর্ঘটনায় পঙ্গু হয়ে যাওয়া প্রতিবন্ধীরা হারানো জীবনের সুখ-স্মৃতি রোমন্থন করে আরো বেশি কষ্ট পায়।

বিশেষ চাহিদার জনগোষ্ঠীঃ প্রতিবন্ধী

প্রতিবন্ধীজনিত সমস্যা

প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের ক্ষেত্রে শিক্ষা সব থেকে অবহেলিত বিষয়। শিক্ষাক্ষেত্রে প্রবেশে তাদেরকে বহু সমস্যার মধ্যে পড়তে হয়। ব্যক্তি, সমাজ এবং শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান পরিচালনার সাথে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের অজ্ঞতা ও নেতিবাচক মনোভাবের কারণে প্রতিবন্ধী শিশুরা শিক্ষাক্ষেত্রে অবহেলিত হচ্ছে। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে 'ইশারা ভাষা' (সাইন ল্যাংগুয়েজ) চালু এবং ব্রেইল সামগ্রী, ব্রেইল বই চালু ও সহজলভ্য করতে পারলে প্রতিবন্ধী শিশু শিক্ষার সুযোগ পাবে।

প্রতিবন্ধীদের পেশা ও কর্মসংস্থানের সুযোগও সীমিত। অনেক ক্ষেত্রে তাদেরকে কর্মস্থলে প্রাপ্ত সম্মান ও বেতন দেয়া হয় না। যুক্তিসঙ্গত কারণ ছাড়াই প্রতিবন্ধীদেরকে কাজ বা চাকুরি থেকে ছাটাই করা হয়। কর্মক্ষেত্রে প্রতিবন্ধীরা সমান হারে সুবিধা ও মজুরি পায় না।

প্রতিবন্ধীরা সবসময় সামাজিক ও মানসিক সমস্যায় ভুগতে থাকে। সমাজের মানুষ প্রতিবন্ধীদের অপয়া মনে করে। প্রতিবন্ধীর মুখ দর্শনকে অমঙ্গল ও অশুভ মনে করা হয়। পরিবারের অন্য সুস্থ সদস্যদের মত সামাজিক আচার-অনুষ্ঠানে তারা যেতে পারে না।

প্রতিবন্ধী কিশোরী ও মহিলাদের সম্পর্কে আমাদের সমাজের বিদ্যমান নেতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি তাদেরকে অসহায় করে তোলে। দু'চারজন ধনী মানুষ তাদের প্রতিবন্ধী মেয়েদের প্রচুর যৌতুক প্রদান করে বা ঘর জামাই রেখে পাত্রস্থ করে থাকেন। সবার ভাগ্যে তা জোটে না।

বিশেষ চাহিদার জনগোষ্ঠীঃ প্রতিবন্ধী

প্রতিবন্ধীজনিত সমস্যা

প্রতিবন্ধী কিশোরী ও মহিলারা বাধা দিতে না পারায় বেশির ভাগ সময় যৌন নির্যাতনের শিকার হয়। এজন্য তারা সবসময় নিরাপত্তাহীনতায় ভোগে। বাংলাদেশে প্রতিবন্ধী নারীদের ওপর যৌন নির্যাতনের হার অত্যন্ত ভয়াবহ।

সমাজে বিদ্যমান কুসংস্কার ও সংকীর্ণ দৃষ্টিভঙ্গির কারণে প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের সম্পূর্ণভাবে পরিবার ও সমাজ থেকে বিচ্ছিন্ন করে রাখা হয়। এমনকি নিজ পরিবারেও প্রতিবন্ধীরা অযত্ন ও অবহেলায় মানুষ হন। পরিবারের অন্যান্য শিশুদের থেকে তাদেরকে অনেকক্ষেত্রেই বঞ্চিত করে রাখা হয়। শিক্ষা, খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থান, চিকিৎসার মত মৌলিক অধিকার ভোগের ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধী শিশুরা বঞ্চনার শিকার হয়। প্রতিবন্ধীরা মানবাধিকার সংশ্লিষ্ট বিষয় থেকেও বঞ্চিত। এজন্যই তারা যৌন নিপীড়ন ও শারীরিক নিপীড়নের শিকার হয়।

প্রতিবন্ধীরা সমাজের সব কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণ করতে পারে না। চাকরি বা উৎপাদন কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণ করতে পারে না। এমনকি নিজেদের যত্নটুকুও নিজেরা নিতে পারেন না। পরনির্ভরশীলতাই যেন তাদের অদৃষ্টলিপি। সব সময় তারা অপরের গলগ্রহ হয়ে বেঁচে থাকেন। সমাজে তারা অনেক সময় অবহেলিত, সুবিধাবঞ্চিত এবং অযত্নে-অনাদরে মৃত্যুর দিন গুণতে বাধ্য হন। তারা সকলের করুণা ও উপহাসের পাত্র হয়ে পড়েন। এ এক দুর্বিষহ জীবন।

বিশেষ চাহিদার জনগোষ্ঠীঃ প্রতিবন্ধী

প্রতিবন্ধীজনিত সমস্যা সমাধানের উপায়

প্রতিবন্ধীরা আমাদেরই কারো ভাই, কারো বোন বা কারো সন্তান। তারা আমাদেরই আপনজন। তাদের প্রতি আমাদের নিম্নলিখিত ক্ষেত্রে নজর দিতে হবে:

১. পঙ্গুত্ব বা অঙ্গহানিকে আল্লাহ্র অভিশাপ, গজব বা আল্লাহ্ প্রদত্ত মনে না করে এর চিকিৎসা, প্রতিকার ও প্রতিরোধের জন্য কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে,

২. বেপরোয়া যানবাহন পরিচালনার জন্য কঠোর শাস্তির বিধান এবং তা কার্যকর করতে হবে,

৩. পথচারীদেরকে রাস্তা পারাপারের সময় ওভারব্রিজ ব্যবহার, জেব্রা ক্রসিং দিয়ে রাস্তা অতিক্রম, রাস্তার নির্দিষ্ট দিক ধরে সাবধানে চলাচল করার জন্য সচেতনতা সৃষ্টি করতে হবে,

৪. কলকারখানাকে ঝুঁকিমুক্ত রাখতে সব ধরনের সতর্কতামূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে,

৫. গর্ভকালীন কিংবা সন্তান ভূমিষ্ট হবার সময় যেন আঘাত প্রাপ্ত না হয় সেদিকে মা'কে সাবধানী হতে হবে,

বিশেষ চাহিদার জনগোষ্ঠীঃ প্রতিবন্ধী

প্রতিবন্ধীজনিত সমস্যা সমাধানের উপায়

৬. সন্তান প্রসব করানোর জন্য প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ও অভিজ্ঞ চিকিৎসক, নার্স বা ধাত্রীর সাহায্য ও পরামর্শ নিতে হবে,

৭. গর্ভাবস্থায় মায়ের প্রয়োজনীয় চিকিৎসা ও পুষ্টিকর খাবার দিতে হবে,

৮. প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্কুল পাঠক্রম এবং সমাজ ও পরিবারভিত্তিক বিশেষ কার্যক্রমের মাধ্যমে স্বাস্থ্য ও পুষ্টি শিক্ষার ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে,

৯. নিরাপদ পানি ও আয়োডিনযুক্ত লবণ উৎপাদন ও সরবরাহ করতে হবে,

১০. শিশুর জন্মপূর্ব ও জন্মোত্তর সেবা প্রদান সম্পর্কে মা-বাবাকে সচেতন করে তুলতে হবে,

১১. শিশু অবস্থায় রোগ প্রতিরোধক টিকা, ইনজেকশন দিতে হবে,

১২. প্রতিবন্ধীদের জন্য বিশেষ শিক্ষার ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। দৃষ্টি প্রতিবন্ধী ছাত্রছাত্রীদের 'ব্রেইল পদ্ধতি'র শিক্ষাদান চালু করতে হবে,

বিশেষ চাহিদার জনগোষ্ঠীঃ প্রতিবন্ধী

প্রতিবন্ধীজনিত সমস্যা সমাধানের উপায়

১৩. প্রতিবন্ধীদের জন্য উপযোগী কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করতে হবে,
১৪. শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, চাকরিসহ সব ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধীদের জন্য কোটা সংরক্ষণ করতে হবে,
১৫. প্রতিবন্ধীদের প্রতি পরিবার, সমাজ, রাষ্ট্র ও এনজিও এবং আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানগুলোকে আরও কার্যকর ভূমিকা পালন করতে হবে,
১৬. বিশেষ চাহিদার জনগোষ্ঠী অর্থাৎ প্রতিবন্ধীদের চিকিৎসাগত সহযোগিতা, চিকিৎসা পুনর্বাসন, প্রযুক্তিগত, বৃত্তিমূলক ও সামাজিক পুনর্বাসনের জন্য সরকার ও বেসরকারি উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে। সবশেষে বলতে হয়, প্রতিবন্ধিত্বকে আল্লাহ্র গজব, অভিশাপ ইত্যাদি না ভেবে এগুলোর চিকিৎসা, প্রতিকার ও প্রতিরোধে সজাগ হতে হবে। ইতোমধ্যে বাংলাদেশে প্রতিবন্ধীদের উন্নয়নকল্পে 'জাতীয় প্রতিবন্ধী ফোরাম' গঠিত হয়েছে। এ ফোরাম জাতীয় নীতিমালাও প্রণয়ন করেছে। ২০০৬ সালের ১৩ ডিসেম্বর জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদ ৬১তম অধিবেশনে 'প্রতিবন্ধীদের অধিকার সনদ' প্রণয়ন করেছে। অন্ধদের জন্য টঙ্গিতে গড়ে ওঠেছে 'জব অরিয়েন্টেড সেন্টার'। দেশের অনেক জায়গায় বোবা ও বধিরদের জন্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ কেন্দ্র গড়ে ওঠেছে। এগুলো সবই আশার কথা। আমাদের সবার উচিত দয়া, করুণা ও অবহেলা প্রদর্শন না করে প্রতিবন্ধীদের পাশে দাঁড়ানো, তাদের সুন্দরভাবে বেঁচে থাকার জন্য কিছু একটা করা। প্রতি বছর ৩ ডিসেম্বর 'বিশ্ব প্রতিবন্ধী দিবস' হিসেবে পালিত হয়।

THANK YOU

HSC
একাডেমিক কোর্স

পৌরনীতি ও সুশাসন ২য় পত্র

অধ্যায়ঃ ১০ – নাগরিক সমস্যা ও আমাদের করণীয়

টপিক – ০২ দুর্নীতি

টপিক ০২: দুর্নীতি

This Topic is important for

MCQ	সৃজনশীল	
	ক	খ
	গ	ঘ

দুর্নীতি

দুর্নীতি একটি মারাত্মক সামাজিক ব্যাধি। সাধারণভাবে দুর্নীতি বলতে ঘুষ লেনদেন, প্রতারণা, স্বজনপ্রীতি, ক্ষমতার অপব্যবহার ইত্যাদিকে বোঝায়।

সাম্প্রতিককালে 'দুর্নীতি' বিষয়টি সমগ্র বিশ্বে বহুল আলোচিত। দুর্নীতির কারণে পৃথিবীর অনেক রাষ্ট্রে সরকারের বিরুদ্ধে আন্দোলন হয়েছে এবং হচ্ছে। তবে দুর্নীতির বিষয়টি নিয়ে অতীতেও আলোচনা ছিল। কৌটিল্য প্রায় দু'হাজার বছর আগে তাঁর 'অর্থশাস্ত্রে' দুর্নীতি নিয়ে আলোচনা করেছিলেন। শেকসপীয়ার তাঁর অনেক নাটকে দুর্নীতির বিষয়টি তুলে ধরেছেন। তবে 'দুর্নীতি' বিষয়টি বর্তমান সময়ে সবাইকে সব থেকে বেশি ভাবিয়ে তুলেছে। 'ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল' মনে করে "সমকালীন বিশ্বের অন্যতম বড় চ্যালেঞ্জ হচ্ছে দুর্নীতি। এটি সুশাসনকে দুর্বল করে, সরকারি নীতিসমূহকে কলুষিত করে, সম্পদের অসম বণ্টন ঘটায় এবং বেসরকারি খাতকে বিশেষ করে দরিদ্র জনগণের দুর্ভোগ বাড়ায়।"

দুর্নীতি

'দুর্নীতি' শব্দটির ইংরেজি প্রতিশব্দ হলো Corruption. শব্দটি এসেছে ল্যাটিন শব্দ Corruptus থেকে, যার অর্থ ধ্বংস বা ক্ষতিসাধন। 'দুর্নীতি' নেতিবাচক শব্দ। আভিধানিক অর্থে দুর্নীতি হলো নীতি বিরুদ্ধ আচরণ। Oxford Dictionary-তে বলা হয়েছে, 'দুর্নীতি অর্থ অস্বাভাবিক উপায়ে কোনো কিছু করা। Social work Dictionary-তে দুর্নীতির সংজ্ঞা দিতে গিয়ে বলা হয়েছে, "রাজনৈতিক ও সরকারি প্রশাসনে ঘুষ, বল প্রয়োগ, ভয় প্রদর্শন, প্রভাব বিস্তার, ব্যক্তিবিশেষকে বিশেষ সুযোগ-সুবিধা প্রদানের মাধ্যমে ক্ষমতার অপব্যবহার এবং এসবের মাধ্যমে ব্যক্তিগত সুবিধা গ্রহণকেই দুর্নীতি বলে"। জাতিসংঘ প্রণীত Manual on Anti-Corruption Policy-তে বলা হয়েছে যে, 'ব্যক্তিগত স্বার্থ উদ্ধারের জন্য ক্ষমতার অপব্যবহারই হলো দুর্নীতি' (The abuse of Public office for Private gain)। রোজ-আকারম্যান (Rose Ackerman)-এর মতে "দুর্নীতি হলো ঘুষের বিনিময়ে যেরূপ সুবিধা পাওয়া যা এটা ছাড়া পাওয়া যেতনা।" কলিন নাই (Colin Nye)-এর মতে "দুর্নীতি হলো সেই আচরণ যা ব্যক্তিগত সম্পদ বা মর্যাদা অর্জনের লক্ষ্যে সরকারি ভূমিকা পালনকারীর (নির্বাচিত বা মনোনীত) আনুষ্ঠানিক কর্তব্য পালনের ক্ষেত্রে বিচ্যুতি ঘটায়।" ভারতীয় সমাজবিজ্ঞানী রামনাথ শর্মার মতে, 'অবৈধ সুযোগ-সুবিধা গ্রহণের জন্য কোনো ব্যক্তির নির্দিষ্ট দায়িত্ব পালনে স্বেচ্ছাকৃত অবহেলাই হচ্ছে দুর্নীতি'। Asian Development Bank-এর মতে, 'দুর্নীতি হলো সরকারি ও বেসরকারি পদে অধিষ্ঠিত থেকে ক্ষমতার অপব্যবহারের মাধ্যমে ব্যক্তিগতভাবে লাভবান হওয়া'।

দুর্নীতি

দুর্নীতির দু'টি সুন্দর সংজ্ঞা প্রদান করেছে বাংলাদেশ 'দুর্নীতি দমন কমিশন' (দুদক)। দুদক প্রকাশিত একটি হ্যান্ড ব্রুশিয়ারে দুর্নীতি কাকে বলে প্রসঙ্গে বলা হয়েছে যে, 'ব্যক্তি স্বার্থ অর্জনের বা ব্যক্তিগত লাভের উদ্দেশ্যে অর্পিত ক্ষমতার অপব্যবহারই দুর্নীতি'। একই ব্রুশিয়ারে দুদক প্রদত্ত দ্বিতীয় সংজ্ঞাটিতে বলা হয়েছে যে, 'যে কর্মকাণ্ড সাধারণভাবে বিবেকের কাছে গ্রহণযোগ্য নয়, তাকেই দুর্নীতি বলা হয়'।

উইকিপিডিয়াতে বলা হয়েছে 'সত্যশীলতা, সদগুণ বা নৈতিক নীতির ক্ষতিসাধন, নষ্টকরণ, অপকর্মে, বেআইনী কর্মে বা অনুচিত কর্মে উৎসাহ প্রদানই দুর্নীতি।'

সুতরাং দুর্নীতি বলতে শুধু ঘুষ গ্রহণকেই বোঝায় না। ক্ষমতার অপব্যবহার করে ব্যক্তিগতভাবে লাভবান হবার চেষ্টা, স্বজনপ্রীতি, অন্যায় আচরণের পৃষ্ঠপোষকতা বা সমর্থন প্রদান ইত্যাদিও দুর্নীতি।

উপরের সংজ্ঞাগুলো ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ করলে নিম্নলিখিত কাজগুলোকে দুর্নীতি বলা যায়: ১. ঘুষ গ্রহণ, ২. অর্থ বা সম্পদ আত্মসাৎ, ৩. ক্ষমতা ও অবস্থানের অসৎ ও অসাধু অপব্যবহার, ৪. ভীতি প্রদর্শন করে অর্থ-সম্পদ আদায় বা সুযোগ সুবিধা গ্রহণ, ৫. প্রতারণা, ৬. স্বজনপ্রীতি, ৭. রাষ্ট্রীয় সম্পদের অপব্যবহার, ৮. সরকারি সম্পদ ক্রয়-বিক্রয়ে অসচ্ছতা, ৯. দায়িত্ব পালনে অবহেলা, ১০. অসৎ উদ্দেশ্যে প্রভাব বিস্তার, ১১. ব্যক্তিস্বার্থ উদ্ধারের জন্য অন্যের ওপর মানসিক নির্যাতন চালানো।

দুর্নীতি

দুর্নীতির প্রভাব বা ক্ষতিকর দিক

দুর্নীতির ক্ষতিকর দিক একাধিক। এগুলো হলো:

১. দুর্নীতি জনগণের দুর্ভোগ বাড়ায়,

২. দুর্নীতি জাতীয় উন্নয়নের অন্তরায়,

৩. দুর্নীতি দারিদ্র্যের মূল কারণ,

৪. দুর্নীতি সামাজিক বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করে,

৫. দুর্নীতি জাতীয় সংহতি বিপন্ন করে,

৬. দুর্নীতির ফলে রাষ্ট্রযন্ত্র ব্যক্তি বা দলীয় স্বার্থ উদ্ধারের হাতিয়ারে পরিণত হয়,

৭. দুর্নীতির ফলে জীবনযাত্রার ব্যয় বাড়ে,

৮. দুর্নীতির ফলে রাষ্ট্রীয় সম্পদের অপচয় হয়,

৯. দুর্নীতির ফলে একশ্রেণির মানুষ রাতারাতি সম্পদের পাহাড় গড়ে তোলায় সামাজিক বৈষম্যের সৃষ্টি হয়,

১০. দুর্নীতি সুস্থ গণতান্ত্রিক সংস্কৃতি বিকাশে অন্তরায় সৃষ্টি করে,

১১. দুর্নীতি সরকারি নীতিসমূহকে কলুষিত করে,

১২. দুর্নীতি জাতীয় সম্পদের অসম বণ্টন ঘটায়।

দুর্নীতি

দুর্নীতির প্রভাব বা ক্ষতিকর দিক

একাধিক কারণে দুর্নীতি সংঘটিত হয়। এগুলো নিম্নরূপ:

১. রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানে স্বচ্ছতার অভাব,
২. রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠান পরিচালনাকারীদের জবাবদিহিতার অভাব,
৩. জনপ্রশাসনে অবাঞ্চিত রাজনৈতিক হস্তক্ষেপ,
৪. আমলাদের প্রভুসুলভ মানসিকতা ও ক্ষমতার বাড়াবাড়ি,
৫. আমলাদের দায়িত্বে অবহেলা ও দক্ষতার অভাব,
৬. আমলাদের মেধা ও গুণগত মানের নিম্নগামিতা,
৭. উচ্চাভিলাষ ও ভোগে প্রবণতা বৃদ্ধি,
৮. আয়-ব্যয়ের অসামঞ্জস্যতা,
৯. বেকার যুবকদের ঘুষ প্রদান করে চাকরি লাভে মরিয়া হয়ে ওঠা,
১০. সৎ উপার্জন দ্বারা জীবিকা নির্বাহ করতে না পারা বা হিমশিম খাওয়া,
১১. অর্থ সম্পদ সামাজিক মান-মর্যাদা পরিমাপের মাপকাঠি হওয়া,
১২. রাতারাতি অধিক অর্থ সম্পদের মালিক হবার প্রবণতা,

দুর্নীতি

দুর্নীতির প্রভাব বা ক্ষতিকর দিক

১৩. প্রাতিষ্ঠানিক নিয়ন্ত্রণের অনুপস্থিতি,
১৪. আইনের যথাযথ প্রয়োগ না হওয়া,
১৫. দেশপ্রেম ও নৈতিক শিক্ষার অভাব,
১৬. রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতা,
১৭. আর্থিক অস্বচ্ছলতা ও জীবনযাত্রার নিম্নমান,
১৮. তথ্য জানার অধিকার সংক্রান্ত আইনের অভাব,
১৯. বাক স্বাধীনতার অভাব,
২০. গণমাধ্যমের স্বাধীনতার অভাব,
২১. দূর্বল আর্থিক ব্যবস্থাপনা বিশেষ করে দূর্বল কর প্রশাসন,
২২. আইনের শাসনের অভাব,
২৩. বিচার বিভাগের স্বাধীনতার অভাব,
২৪. ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণের অভাব,
২৫. সৎ কর্মচারীদের যথাযথ মূল্যায়ন না করা।

দুর্নীতি

দুর্নীতির প্রতিরোধের উপায়

নিম্নলিখিত উপায়ে দুর্নীতি প্রতিরোধ করা যেতে পারে :

১. স্বাধীন, যথার্থ ক্ষমতাসম্পন্ন ও সক্রিয় দুর্নীতি দমন কমিশন গঠন করা,
২. আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা করা,
৩. বিচার বিভাগের স্বাধীনতা ও নিরপেক্ষতা নিশ্চিত করা,
৪. ন্যায়পালের পদ সৃষ্টি এবং দায়িত্ব অর্পণ করা,
৫. প্রশাসনিক জবাবদিহিতার নীতি কার্যকর করা,
৬. দক্ষ, নিরপেক্ষ প্রশাসন গড়ে তোলা,
৭. সরকারের দায়িত্বশীল ও জবাবদিহিমূলক মানসিকতা সৃষ্টি,
৮. ধর্মীয় অনুশাসন ও নৈতিক মূল্যবোধ সৃষ্টি,
৯. সামাজিক চেতনা সৃষ্টির জন্য কার্যকর কর্মসূচি প্রণয়ন ও তা বাস্তবায়ন,
১০. দুর্নীতির বিরুদ্ধে গণসচেতনতা সৃষ্টি এবং রুখে দাঁড়ানো,
১১. দুর্নীতিবাজদের সামাজিকভাবে বয়কট করা,
১২. দুর্নীতি প্রতিরোধে দৃঢ় রাজনৈতিক অঙ্গীকার ঘোষণা ও তা বাস্তবায়ন,
১৩. সরকারের সুদৃঢ় ও সময়োপযোগী কর্মকৌশল গ্রহণ,

দুর্নীতি

দুর্নীতির প্রতিরোধের উপায়

১৪. রাজনৈতিক দল কর্তৃক সৎ, যোগ্য ও দেশপ্রেমিক ব্যক্তিদের নির্বাচনে মনোনয়ন প্রদান,

১৫. রাজনৈতিক দল পরিচালনায় অসৎ উৎস থেকে তহবিল সংগ্রহ না করা,

১৬. জাতীয় সংসদ অর্থাৎ আইনসভাকে কার্যকর ও গতিশীল করে তোলা,

১৭. জাতীয় সংসদের কমিটিগুলোকে বিশেষ করে সরকারি হিসাব সম্পর্কিত স্থায়ী কমিটিকে দুর্নীতি প্রতিরোধ ও সুশাসন প্রতিষ্ঠার জন্য ক্ষমতাসম্পন্ন করে তোলা,

১৮. সরকারি বেসরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারীদের জন্য বাজার মূল্যের সাথে সামঞ্জস্য বিধান করে বেতন কাঠামো নির্ধারণ ও অন্যান্য সুযোগ-সুবিধা প্রদান করা,

১৯. দুর্নীতিবাজদের ঘৃণা করা এবং তাদের সম্পর্কে দুর্নীতি দমন কমিশনকে অবহিত করা,

২০. নাগরিক অধিকার সম্পর্কে জনসচেতনতা বৃদ্ধি করা,

২১. সকল নাগরিকের এ মর্মে প্রতিজ্ঞা করা যে, দুর্নীতি করবো না, দুর্নীতি মানবোনা এবং দুর্নীতি সইবো না,.

দুর্নীতি

দুর্নীতির প্রতিরোধের উপায়

২২. দুর্নীতি থেকে প্রতিকার পাবার জন্য প্রয়োজন কঠোর রাজনৈতিক অঙ্গীকার,
২৩. দুর্নীতি প্রতিরোধ করার জন্য গণমাধ্যমের সজাগ ও সচেতন ভূমিকা পালন,
২৪. রাজনৈতিক অঙ্গীকার (Political Commitment),
২৫. প্রয়োজনীয় আইন প্রণয়ন ও তা প্রয়োগ করা,
২৬. সরকারি নিরীক্ষক কমিটি গঠন করা,

দুর্নীতি

বাংলাদেশে দুর্নীতির চিত্র

বাংলাদেশে দুর্নীতির বিস্তার ঘটেছে ব্যাপকভাবে। দেশে-বিদেশে এজন্য আমাদের দেশের ভাবমূর্তি বিনষ্ট হচ্ছে। দুর্নীতি বিরোধী আন্তর্জাতিক সংগঠন 'ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল'-এর দুর্নীতি বিষয়ক গবেষণা জরিপে পর পর কয়েক বছর বাংলাদেশকে পৃথিবীর অন্যতম দুর্নীতিগ্রস্ত দেশ হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়েছে। এছাড়াও বিশ্বব্যাংক, ইউএনডিপি, জাতিসংঘ বাণিজ্য ও উন্নয়ন সংস্থাসহ আন্তর্জাতিক অনেক সংগঠন তাদের সাম্প্রতিক রিপোর্টগুলোতে বাংলাদেশের দুর্নীতি বিষয়ে আশঙ্কা প্রকাশ করেছে। বিশ্বব্যাংকের Country Procurement Assessment সম্পর্কিত সাম্প্রতিক এক রিপোর্টে বলা হয়েছে যে, 'সরকারি অফিসে ঘুষ ছাড়া ফাইল নড়ে না। ঘুষ এমন এক পর্যায়ে পৌছেছে যেন এটা বেতনের অংশ হয়ে গেছে। ঘুষ না দিলে কোনো কাজ হয় না, ঘুষ না পেলে সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারীর কাজে উৎসাহ পায় না।' 'ডেমোক্রেসি ওয়াচ' নামক একটি গবেষণা প্রতিষ্ঠান তাদের ২০০০ সালে প্রকাশিত রিপোর্টে বলেছে যে, 'দেশের ৯৫ শতাংশ মানুষ মনে করে যে, পুলিশ সব থেকে দুর্নীতিপরায়ণ। একই ধারণা পোষণ করে 'এ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনালও'।

বাংলাদেশে দুর্নীতির চিত্র

এছাড়াও তাদের রিপোর্টে শিক্ষাখাত, স্থানীয় সরকার খাত, স্বাস্থ্যখাত, বন ও পরিবেশ খাত প্রভৃতিতে দুর্নীতির হতাশাব্যঞ্জক চিত্র ফুটে উঠেছে।-

বাংলাদেশ এখনো একটি দরিদ্র দেশ। দারিদ্র্য এদেশের জনগোষ্ঠীর বৃহৎ অংশকে এখনো মানবেতর জীবন যাপন করতে বাধ্য করছে। বিদেশি সাহায্য এনে আমাদের উন্নয়নের চাকা সচল রাখতে হয়। অথচ সেই প্রাপ্ত সাহায্য যদি দুর্নীতিগ্রস্ত লোকদের পকেটস্থ হয় তাহলে এদেশের উন্নয়ন কোনোদিনই হবে না। এজন্য এ মুহূর্তে সবার মনেপ্রাণে এ শপথ গ্রহণ করতে হবে যে, আমরা দুর্নীতি করবোনা, দুর্নীতি মানবোনা, দুর্নীতি সইবোনা।

দুর্নীতি দমন কমিশন

২০০৪ সালের ২৩ ফেব্রুয়ারি বাংলাদেশে 'দুর্নীতি দমন কমিশন' গঠিত হয় এবং ২০০৪ সালের ৯ মে থেকে দুর্নীতি দমন কমিশন আইন কার্যকর হয়েছে। দুর্নীতি দমন কমিশন ২০০৭ সালের ২৯ মার্চ উক্ত আইনের ৩৪-এ ধারা প্রদত্ত ক্ষমতাবলে প্রজ্ঞাপন জারি করেছে। একজন চেয়ারম্যান ও দুজন কমিশনার নিয়ে গঠিত দুর্নীতি দমন কমিশন কার্যালয় ঢাকার সেগুনবাগিচায় অবস্থিত। এ সংস্থার লক্ষ্য হচ্ছে দেশে দুর্নীতি ও দুর্নীতিমূলক কাজ প্রতিরোধ করা। যে কোনো ব্যক্তি অথবা সংস্থার বিরুদ্ধে কমিশনের এখতিয়ারভুক্ত বিষয়ে কোনো অভিযোগ সমন্বিত জেলা কার্যালয়, বিভাগীয় কার্যালয় অথবা সেগুনবাগিচা, ঢাকাস্থ প্রধান কার্যালয়ে প্রেরণ করা যাবে।

সদ্য গঠিত 'বাংলাদেশ দুর্নীতি দমন কমিশন' দুর্নীতির বিরুদ্ধে বেশকিছু পদক্ষেপ গ্রহণ করছে। এদেশের জনগণ আশা করে যে, দুর্নীতি দমন কমিশন দুর্নীতিমুক্ত বাংলাদেশ গড়তে বলিষ্ঠ পদক্ষেপ গ্রহণ করতে সক্ষম হবে।

THANK YOU

HSC
একাডেমিক কোর্স

পৌরনীতি ও সুশাসন ২য় পত্র

অধ্যায়ঃ ১০ – নাগরিক সমস্যা ও আমাদের করণীয়

টপিক – ০৩ খাদ্যে ভেজাল

টপিক ০৩: খাদ্যে ভেজাল

This Topic is important for

MCQ	সৃজনশীল
	ক খ
	গ ঘ

খাদ্যে ভেজাল

খাদ্যে ভেজালের ধারণা

'ভেজাল' শব্দটি সাম্প্রতিককালে পৃথিবীর প্রায় সর্বত্র বহুল উচ্চারিত একটি শব্দ। উৎকৃষ্ট দ্রব্যের সাথে নিকৃষ্ট দ্রব্য মেশানোকেই ভেজাল বলে। সাধারণভাবে আমরা খাদ্যে ভেজাল বলতে বুঝি প্রাকৃতিক ও স্বাভাবিক খাদ্যদ্রব্যে নিম্নমানের, ক্ষতিকর, অকেজো, অপ্রয়োজনীয় এবং বিশুদ্ধ বা খাঁটি নয় এমন কিছু মেশানোকে বোঝায়। গুণগতভাবে নির্ধারিত মানসম্মত নয় এবং স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর এমন খাদ্যদ্রব্যকে 'ভেজাল খাদ্য' মনে করা হয়।

খাদ্যে ভেজাল একটি মারাত্মক সামাজিক অপরাধ। খাদ্যে ভেজাল নিয়ে সমস্ত বিশ্ববাসী আজ উদ্বিগ্ন। খাদ্যদ্রব্যে ভেজালের বিষয়টি এখন উদ্বেগের সীমা ছাড়িয়ে ভীতি বা আতঙ্কের বিষয়ে পরিণত হয়েছে। খাদ্যে ভেজালের সাথে লোভী ব্যক্তিরা সমাজ ও রাষ্ট্রের শত্রু; তারা জঘন্য অপরাধী এবং মানবতার শত্রু। রোগমুক্ত সুস্থ সুন্দর জীবনের নিশ্চয়তা বিধানের জন্য ভেজাল প্রতিরোধে বিশ্বের সকল মানুষেরই সোচ্চার হতে হবে, প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।

খাদ্যে ভেজাল

খাদ্যে ভেজালের সাম্প্রতিক চিত্র

কোমল পানীয় তৈরিতে তরল গ্লুকোজ বা চিনির সিরাপের পরিবর্তে প্রায়শই ব্যবহৃত কার্বোক্সি মিথাইল সেলুলোজ মেশানো হচ্ছে। চাল-ডাল-আটা-ময়দা আমাদের প্রধান খাদ্য। ভালো চালের সাথে নিম্নমানের চাল মেশাচ্ছে। ওজন বৃদ্ধির জন্য চালে পাথর ও বালি মেশাচ্ছে। চালের রং উজ্জ্বল করার জন্য ইউরিয়া ও অন্যান্য ক্ষতিকর রাসায়নিক পদার্থ মেশাচ্ছে বা তা দিয়ে শোধন করছে। বাজারের বেশির ভাগ ডালই ভেজাল ও খাওয়ার অনুপযোগী। ডালেও মেশানো হয় ক্ষতিকর রং এবং মাইটক্সিন নামে বিষাক্ত কেমিক্যাল। আটা-ময়দাতেও মেশানো হচ্ছে ভেজাল, বিশেষ করে কাঠের গুড়ো। পাউরুটি, বিস্কুট এবং নুডুলস তৈরিতে ব্যবহৃত আটা-ময়দায় ভেজালের হার আরও বেশি। বিস্কুট, সেমাই, নুডুলস, জুস ও মিষ্টিতে মেশানো হয় টেক্সটাইল ও লেদারের রং। এগুলো বিষাক্ত। জিলাপী, চানাচুর, চিপস মচমচে করার জন্য মবিল মেশানো হচ্ছে।

বাজারে এখন যেসব মিনারেল ওয়াটার পাওয়া যায় তার ৯৫ ভাগই পানের অযোগ্য। বাজারে যে হরেক রকম ব্রান্ডের ফলের জুস পাওয়া যায় সেগুলোর প্রায় ৯৫ ভাগের মধ্যেই কোনো ফলের রস নেই বলে পরীক্ষায় প্রমাণিত হয়েছে। এছাড়া এসব জুস, জ্যাম, জেলিতে যে কৃত্রিম নিষিদ্ধ দ্রব্য এবং বিষাক্ত রং মেশানো হয় তা কিডনি, লিভার ও পেটের জন্য মারাত্মক ক্ষতিকর।

খাদ্যে ভেজাল

খাদ্যে ভেজালের সাম্প্রতিক চিত্র

আমরা 'ভাতে-মাছে বাঙালি'। অথচ যেভাবে মাছ টাটকা রাখার জন্য 'ফরমালিন' নামক বিষাক্ত রাসায়নিক পদার্থ মেশানো হচ্ছে তা স্বাস্থ্যের জন্য মারাত্মক হুমকিস্বরূপ। শুঁটকি মাছে পোকা যেন না ধরে সেজন্য ব্যবসায়ীরা কীটনাশক ও ডিডিটি ব্যবহার করছে। বাংলাদেশে প্রচুর শাক সবজি ও ফলমূল পাওয়া যায়। একশ্রেণির অসাধু ব্যবসায়ী এগুলো টাটকা ও সতেজ রাখার জন্য ফরমালিন ও কার্বো-হাইড্রেড এবং ফলমূলগুলো পাকানোর জন্য ক্যালসিয়াম কার্বাইড, মার্শাল, ইথোপেন, ইথারিল, ডাই এলক্সির বিভিন্ন ধরনের বিষাক্ত কেমিক্যাল ব্যবহার করে থাকে। এগুলো আমাদের কিডনি ও লিভারের ক্ষতি করছে, হৃদ রোগ ও ক্যান্সারের সম্ভাবনা বাড়িয়ে তুলছে এবং অনেকেই অকালে চোখের দৃষ্টি শক্তি হারিয়ে ফেলছেন।

খাদ্যে ভেজাল

খাদ্যে ভেজালের সাম্প্রতিক চিত্র

আমাদের দেশের একশ্রেণির অসাধু ব্যবসায়ী খাবারের তেল, ঘি, ডালডা, বাটারওয়েল প্রভৃতিতে ভেজাল মেশাচ্ছেন। ঘিয়ের সাথে পামঅয়েল ও চর্বি, সরিষার তেলের সাথে পামঅয়েল বা সয়াবিন, নারকেল তেলের সাথে সয়াবিন বা বাদাম তেল মেশাচ্ছে। দুধের মাখন তুলে নিয়ে বিক্রী করছে, দুধে পানি মেশাচ্ছে, মুড়িতে ইউরিয়া সার মেশাচ্ছে। এমনকি গুরো দুধের মত শিশু খাদ্যেও বিষাক্ত মেলামাইন পাওয়া যাচ্ছে। এগুলো মুখে দিলেই বা এর ঘ্রাণ নিলেই বোঝা যায় এগুলোর প্রায় ৭০/৮০ ভাগই ভেজাল, খাওয়ার অনুপযোগী এবং স্বাস্থ্যের জন্য খুবই ক্ষতিকর। অনেকে মাছ, দুধ, মিষ্টি, ফল ইত্যাদিতে ফরমালিন মিশিয়ে এগুলোর পচন রোধ করার চেষ্টা চালায়। এমনকি অসাধু ব্যবসায়ীরা গুঁড়া মশলার সাথেও ইটের গুঁড়া এবং অনেক ক্ষতিকর রাসায়নিক পদার্থ মেশাচ্ছেন, যা স্বাস্থ্যের জন্য খুবই ক্ষতিকর। বাজারে 'আয়োডিনযুক্ত লবণ' বলে যা বিক্রি হচ্ছে তার প্রায় ৯০ ভাগেই আয়োডিন বলে কিছুই নেই।

খাদ্যে ভেজাল

খাদ্যে ভেজালের সাম্প্রতিক চিত্র

আয়োডিনের অভাবে তাই আমাদের দেশে গলগণ্ড রোগ বেড়ে চলছে। মানসিক প্রতিবন্ধীর সংখ্যা বাড়ছে। এছাড়াও আমাদের দেশে হোটেল রেস্তোরাঁগুলোর ভিতরের বিশেষ করে যেখানে খাবার তৈরি হয় সেখানকার চিত্র খুবই নোংরা ও অস্বাস্থ্যকর। এসব হোটেল রেস্তোরাঁয় পচা, বাসি খাবার পরিবেশন করা হয়। খাবারে বিষাক্ত রং, রস ও কেমিক্যাল মেশানো হয়। প্রায়ই সংবাদপত্রে প্রকাশিত হতে দেখা যায় যে, ভ্রাম্যমাণ পরিদর্শক টিম হোটেলগুলোতে মরা মুরগি, পচা মাছ-মাংস ব্যবহার করতে দেখেছেন, শাস্তি দিয়েছেন। এমনকি এদেশে হোটেল-রেস্তোরাঁয় কুকুরের মাংস পরিবেশনের সংবাদও প্রকাশিত হয়েছে একাধিকবার।

খাদ্যে ভেজাল

খাদ্যে ভেজালের কারণ

খাদ্যে ভেজাল দেয়ার পিছনে প্রধান কারণগুলো হলো নিম্নরূপ:

১. উৎপাদক ও ব্যবসায়ীদের অসৎ মানসিকতা ও অনৈতিক চরিত্রই খাদ্যে ভেজালের প্রধান কারণ,

২. অসৎ উপায়ে অতি দ্রুত বড়লোক হবার উদগ্র বাসনা,

৩. অধিক মুনাফা লাভের আশা,

৪. অসৎ কাজে লিপ্ত হবার জন্য বিবেকের দংশন অনুভব না করা,

৫. অসৎ কাজে লিপ্ত হবার জন্য ধর্মভয় বা পরকালের শাস্তির কথা চিন্তা না করা,

৬. সমাজের কার কী ক্ষতি হলো সে সম্পর্কে চিন্তা, দুঃখ বা অনুশোচনার অভাব,

৭. খাদ্যের পচন ঠেকানোর জন্য ক্ষতিকারক রাসায়নিক দ্রব্য প্রয়োগ,

৮. ফলমূল তাড়াতাড়ি পাকানো ও রং সুন্দর করার জন্য ক্ষতিকর রাসায়নিক দ্রব্য ব্যবহার,

৯. খাদ্যের স্বাদ বা ফ্লেভার বাড়ানো বা খাদ্যকে দৃষ্টিনন্দন করার জন্য ভেজালের মতো নিকৃষ্ট পথ বেছে নেয়া,

খাদ্যে ভেজাল

খাদ্যে ভেজালের কারণ

১০. দেশে প্রচলিত আইনের অপ্রতুলতা এবং যে আইন বিদ্যমান রয়েছে তার যথোপযুক্ত ব্যবহার না করা,
১১. রং, কেমিক্যাল ও কীটনাশকের অবাধ ব্যবহার,
১২. সচেতনতার অভাব,
১৩. সহজে অর্থ উপার্জনের লোভ বা মানসিকতা,
১৪. যথার্থ শিক্ষা বা সুশিক্ষার অভাব,
১৫. দেশপ্রেমের অভাব,
১৬. আইনের কড়াকড়ির অভাব।

খাদ্যে ভেজাল

খাদ্যে ভেজালের প্রতিকার

খাদ্যে ভেজাল প্রতিকার বা প্রতিরোধে নিম্নলিখিত ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে:

১. খাদ্য উৎপাদন প্রতিষ্ঠানগুলোকে তাঁদের উৎপাদিত দ্রব্যসামগ্রী BSTI-এর দ্বারা মানোত্তীর্ণ হবার সার্টিফিকেট অর্জন এবং তা প্রদর্শন করতে হবে,

২. BSTI-এর দ্বারা পরীক্ষিত নয় এমন উৎপাদিত খাদ্যসামগ্রী বাজারজাত করা হলে সেজন্য কঠিন শাস্তির বিধান এবং তা কার্যকর করতে হবে,

৩. হোটেল রেস্তোরাঁয় পচা-বাসি খাবার যেন পরিবেশন না করা হয় সেজন্য নজরদারি জোরদার করতে হবে। শুধু ঢাকা বা বড় বড় শহর নয়, দেশের সর্বত্র এজন্য ভ্রাম্যমাণ আদালতের তৎপরতা বাড়িয়ে দিতে হবে,

৪. অসৎ ব্যবসায়ী, উৎপাদক, পরিবেশকদের বিরুদ্ধে কী শাস্তি প্রদান করা হলো, ভোক্তা অধিকার সংস্থা ও ভ্রাম্যমাণ আদালত কী করছে তা নিউজ এবং ইলেক্ট্রনিক মিডিয়ায় প্রকাশ ও প্রচার করতে হবে,

খাদ্যে ভেজাল

খাদ্যে ভেজালের প্রতিকার

৫. চাল-ডাল-আটা-ময়দা, ফলমূল প্রভৃতির আড়তগুলোতে নজরদারি বৃদ্ধি করতে হবে এবং অসৎ ব্যবসায়ীদের শাস্তি প্রদান করতে হবে,

৬. বিষাক্ত রাসায়নিক পদার্থ বাজারজাতকরণ ও বিপণন ব্যবস্থার সাথে জড়িতদের ওপর সতর্ক নজরদারি রাখতে হবে যেন এসব পদার্থ খাদ্যে ভেজালের জন্য নয় বরং উপযুক্ত কাজেই শুধু ব্যবহার হয়,

৭. খাদ্যে ভেজাল একটি ঘৃণ্য অপরাধ। এজন্য কঠোর আইন প্রবর্তন এবং তার যথাযথ প্রয়োগ ঘটাতে হবে,

৮. খাদ্যে ভেজাল গোটা জাতিকে ধ্বংস করছে। এ থেকে উৎপাদক, পরিবেশক, ব্যবসায়ী কেউ নিস্তার পাচ্ছে না। কাজেই খাদ্যে ভেজালের ক্ষতিকর দিক সম্পর্কে প্রচার-প্রচারণা জোরদার করতে হবে,

খাদ্যে ভেজাল

খাদ্যে ভেজালের প্রতিকার

৯. খাদ্যে ভেজালের কারণ ও প্রতিকার বিষয়টি পাঠ্যপুস্তকের অন্তর্ভুক্ত করতে হবে,

১০. খাদ্যে ভেজালের বিরুদ্ধে সামাজিক আন্দোলন গড়ে তুলতে হবে, খাদ্যপণ্য সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে সোচ্ছার হতে হবে,

১১. খাদ্য সংরক্ষণের জন্য জনগণবান্ধব এবং স্বাস্থ্যসহায়ক উপায় বা পদ্ধতির উদ্ভাবন করতে হবে,

১২. জনগণ নিজেই যেন ফরমালিনমুক্ত বা ভেজাল পণ্য চিনতে পারে সে পদ্ধতি প্রচার করে জনগণকে সচেতন করে তুলতে হবে।

১৩. খাদ্যপণ্য উৎপাদন থেকে ভোক্তার হাত পর্যন্ত তা পৌছানোর স্তরগুলোকে পরিদর্শনের আওতায় আনা,

১৪. ব্যবসায়ী সংগঠনগুলোর ভেজাল প্রতিরোধ সক্রিয় ভূমিকা পালন।

১৫. সংবাদপত্র, রেডিও-টেলিভিশনসহ সব প্রচার মাধ্যম, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, সেমিনার-সিম্পোজিয়াম এবং সভাসমিতির মাধ্যমে ধর্মীয় ও নৈতিক মূল্যবোধ জাগিয়ে তুলতে হবে।

THANK YOU

HSC
একাডেমিক কোর্স

পৌরনীতি ও সুশাসন ২য় পত্র

অধ্যায়ঃ ১০ – নাগরিক সমস্যা ও আমাদের করণীয়

টপিক – ০৪ ইভ টিজিং

টপিক ০৪: ইভ টিজিং

This Topic is important for

MCQ	সৃজনশীল	
	ক	খ
	গ	ঘ

ইভ টিজিং

'ইভ টিজিং' কথাটি আমাদের দেশে বর্তমানে বহুলভাবে ব্যবহৃত হচ্ছে। ইভটিজিং মূলত প্রকাশ্যে যৌন হয়রানি, পথেঘাটে উত্যক্ত করা বা পুরুষ দ্বারা নারী নির্যাতনের নির্দেশক একটি শব্দ। 'ইভ' শব্দটি বাইবেলের ইভ (Eve) বা পবিত্র কোরআনের 'হাওয়াকে' বোঝায়। অন্যদিকে 'টিজিং' শব্দটির আভিধানিক অর্থ 'পরিহাস বা জ্বালাতন'। সুতরাং 'ইভ' বলতে বোঝায় নারী বা রমণী এবং 'টিজিং' বলতে বোঝায় উত্যক্ত করা বা বিরক্ত করা। একসময় সমাজের বখে যাওয়া একটি ক্ষুদ্র অংশ ইভ টিজিং-এর সাথে জড়িত থাকলেও এখন উঠতি বয়সী তরুণ, কিশোর যুবকরাতো আছেই, অনেক মধ্য বয়সীরাও এর সাথে জড়িত হয়ে পড়েছে।

সাম্প্রতিককালে 'ইভ টিজিং' সমগ্র বিশ্বে বিশেষ করে বাংলাদেশে ভয়ংকর রূপ ধারণ করেছে। এর শিকার হয়ে অনেক মেয়েকে আত্মহননের পথ বেছে নিতে হয়েছে এবং মেয়ের প্রতিবাদী অভিভাবক ও শিক্ষককেও নির্যাতনের শিকার এমনকি প্রাণ হারাতে হয়েছে।

ইভ টিজিং

আধুনিক সভ্য সমাজে 'ইভ টিজিং' শব্দটি 'যৌন হয়রানি' (Sexual Harasssment) হিসেবে চিহ্নিত হয়। Oxford Dictionary-তে এজন্য 'ইভ টিজিং' শব্দটির অর্থ করা হয়েছে 'Harassment of, or sexually aggressive behavior toward women or girls. 'যৌন হয়রানি' হচ্ছে সেই ধরনের কর্মকাণ্ড ও আচরণ যা মানুষের যৌনতাকে উদ্দেশ্য করে মানসিক ও শারীরিকভাবে করা হয়। 'বেইজিং চতুর্থ নারী সম্মেলনে' নারীর প্রতি সহিংসতামূলক যে কোনো ধরনের তৎপরতা, যার ফলে নারীর শারীরিক, মানসিক, যৌন বা মনস্তাত্ত্বিক ক্ষতি বা বিপর্যয় ঘটে বা ঘটতে পারে, তাকে 'নারী নির্যাতন' হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে।

ইভ টিজিং

বাংলাদেশে ইভ টিজিং

বাংলাদেশে বিদ্যমান সামাজিক সমস্যাগুলোর মধ্যে অন্যতম সমস্যা হলো 'ইভ টিজিং'। ইভ টিজিং-এর কারণে আমাদের দেশে অনেক মেয়ে শিশু-কিশোরী তাদের স্বাভাবিক বেড়ে ওঠার পরিবেশ পাচ্ছে না। এর ফলে তাদের জীবনের গতি অসময়ে রুদ্ধ হয়ে যাচ্ছে। বখাটেদের অত্যাচার সহ্য করতে না পেরে আত্মহত্যার ঘটনা আমাদের দেশে অহরহ ঘটছে। গাইবান্ধার শিশু তৃষ্ণা কিংবা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের চারুকলার ছাত্রী সিমি আত্মহননের পথ বেছে নেয়ার পরই বিষয়টি দেশবাসীকে ভাবিয়ে তোলে।

ঢাকা মেট্রোপলিটান পুলিশ অর্ডিন্যান্স, ১৯৭৬-এ ইভ টিজিং-এর সংজ্ঞা দিতে গিয়ে বলা হয়েছে যে, "যদি কোনো পুরুষ সদিচ্ছায় রাস্তা বা প্রকাশ্য স্থানে কোনো নারীকে প্রদর্শন করে কোনো অশ্লীল কথা, অঙ্গভঙ্গি বা অসদাচরণ করে, বা কেউ ইচ্ছা করে কোনো নারীকে বাধা দেয়, তার গতিরোধ করে অপমানজনক কথা বা অশ্লীল উক্তি করে, তবে তা ইভ টিজিং বলে গণ্য হবে।"

২০১১ সালের ২৬ জানুয়ারি বিচারপতি ইমান আলী ও বিচারপতি শেখ হাসান আরিফের সমন্বয়ে গঠিত বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্টের হাইকোর্ট বিভাগের একটি ডিভিশন বেঞ্চ ইভ টিজিংকে 'যৌন হয়রানি' শব্দ দ্বারা প্রকাশ করেছেন এবং বিষয়টিকে আইনে অন্তর্ভূক্ত করার নির্দেশ প্রদান করে।

ইভ টিজিং

বাংলাদেশে ইভ টিজিং

বাংলাদেশ দণ্ডবিধি আইনের ২৯৪ ও ৫০৯ ধারা অনুযায়ী 'ইভ টিজিং' বলতে বোঝায় কোনো নারী বা কিশোরীকে তার স্বাভাবিক চলাফেরা বা কাজকর্ম করা অবস্থায় অশালীন মন্তব্য করা, ভয় দেখানো, তার নাম ধরে ডাকা এবং চিৎকার করা, বিকৃত নামে ডাকা, কোনো কিছু তার দিকে ছুঁড়ে দেয়া, ব্যক্তিত্বে লাগে এমন মন্তব্য করা, ধিক্কার দেয়া, তার যোগ্যতা নিয়ে মন্তব্য করা, অহেতুক হাস্যরস করা, অশ্লীল অঙ্গভঙ্গি করা, ইঙ্গিতপূর্ণ ইশারা করা, অশ্লীলভাবে প্রেম নিবেদন করা, উদ্দেশ্যমূলকভাবে পিছু নেয়া, গান বা কবিতা আবৃতি করা, চিঠি লেখা, মোবাইল ফোনে হয়রানি করা, পথরোধ করে দাঁড়ানো, প্রেমে সাড়া না দিলে হুমকি প্রদান ইত্যাদি।

ইভ টিজিং

যৌন হয়রানিমূলক আচরণসমূহ

২০১১ সালের ২৬ জানুয়ারি সুপ্রিম কোর্টের হাইকোর্ট বিভাগের ডিভিশন বেঞ্চ তাদের ঐতিহাসিক রায়ে যে সব বিষয় 'যৌন হয়রানি' বলে গণ্য হবে বলে ঘোষণা করেছেন তা হলো:

১. যে কোনো অবাঞ্ছিত শারীরিক স্পর্শ বা এ ধরনের চেষ্টা,
২. প্রাতিষ্ঠানিক এবং পেশাগত ক্ষমতা ব্যবহার করে কারও সঙ্গে যৌন সম্পর্ক স্থাপনের চেষ্টা,
৩. যৌন হয়রানি বা নিপীড়নমূলক উক্তি বা মন্তব্য,
৪. যৌন সুযোগ লাভের জন্য অবৈধ আবেদন বা দাবি,
৫. পর্ণোগ্রাফি দেখানো,
৬. যৌন আবেদনমূলক মন্তব্য বা অঙ্গভঙ্গি বা এগুলোর মাধ্যমে মেয়েদের দৃষ্টি আকর্ষণের চেষ্টা,
৭. যৌন ইঙ্গিতমূলক অপমানজনক কোনো কিছু লেখা,
৮. মোবাইলের মাধ্যমে অশ্লীল, কুরুচিপূর্ণ মেসেজ প্রদান,

ইভ টিজিং

যৌন হয়রানিমূলক আচরণসমূহ

৯. ব্লাকমেইল বা চরিত্র হননের জন্য যে কোনো ধরনের স্থির বা চলমান চিত্র ধারণ করা,
১০. প্রেম নিবেদন করে প্রত্যাখ্যাত হয়ে হুমকি দেওয়া বা চাপ প্রয়োগ করা,
১১. যানবাহনে কিংবা পথে চলাচলের সময় ইচ্ছাকৃতভাবে মেয়েদের গা ঘেঁষে দাড়ানো বা বসা বা ধাক্কা দেয়া,
১২. ফেসবুক বা ইন্টারনেটে মেয়েদের সৌন্দর্য বা বিভিন্ন অঙ্গপ্রত্যঙ্গ সম্পর্কে কুরুচিপূর্ণ মন্তব্য করা,
১৩. যৌন নিপীড়ন বা যৌন হয়রানির কারণে প্রাতিষ্ঠানিক খেলাধুলা, সাংস্কৃতিক এবং শিক্ষা কার্যক্রমে অংশগ্রহণ থেকে বিরত থাকতে বাধ্য করা।

ইভ টিজিং

ইভ টিজিং এর কারণ

যৌন হয়রানির উল্লেখযোগ্য কারণগুলো নিম্নরূপ:

১. সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও পারিবারিক জীবনে নৈতিক মূল্যবোধের অভাব,

২. নারীর প্রতি নেতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি,

৩. গণমাধ্যমে তথা বিজ্ঞাপন, মিউজিক ভিডিও, সিনেমা ইত্যাদিতে নারীকে যৌনবস্তু (Sex object) হিসেবে উপস্থাপন বা প্রদর্শন করা,

৪. সমাজে অবাধ পর্ণোগ্রাফির ছড়াছড়ি,

৫. স্যাটেলাইট টিভির অবাধ ও অনিয়ন্ত্রিত প্রদর্শন,

৬. মোবাইল ফোন ও অন্যান্য তথ্যপ্রযুক্তির অপব্যবহার,

৭. পারিবারিক বন্ধন সুদৃঢ় করা ও বিবাহ বিচ্ছেদ রোধ করা,

৮. ইভ টিজিং এর ক্ষতিকর দিক সম্পর্কে ছাত্র-ছাত্রীদের মাঝে শিক্ষকদের আলোচনা না করা,

৯. সুস্থ সংস্কৃতি চর্চার অভাব,

১০. পরিবারের অসচেতনতা বা পিতা-মাতার উদাসীনতা,

১১. ধর্মীয় অনুশাসন না থাকা,

১২. যৌন হয়রানি রোধে সুনির্দিষ্ট কোনো আইন না থাকা,

ইভ টিজিং

ইভ টিজিং এর কারণ

১৩. দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি প্রদানের ব্যবস্থা না থাকা,
১৪. পরিবারে নারীদের যথাযথ মূল্যায়ন না করা,
১৫. বেকারত্বের কারণে সৃষ্ট হতাশা,
১৬. মাদক নিয়ন্ত্রণে যথোপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ না করা,
১৭. মেয়েদের বেপরোয়া চলাফেরা ও অশালীন পোশাক পরিচ্ছদ,
১৮. রাজনৈতিক প্রশ্রয়,
১৯. প্রশাসনিক উদাসীনতা,
২০. সুস্থ বিনোদনের অভাব,
২১. শিক্ষা ও সচেতনতার অভাব,
২২. আকাশ-সংস্কৃতির ক্ষতিকর প্রভাব।

ইভ টিজিং

ইভ টিজিং এর প্রতিকার

পথে ঘাটে, স্কুলে, কর্মক্ষেত্রে যৌন হয়রানির কারণে নারীর মানবাধিকার লংঘিত হচ্ছে। স্বাধীনভাবে চলাফেরার অধিকার, জীবনের অধিকার, শিক্ষার অধিকার, 'না' বলার অধিকার এবং স্বাধীনতার অধিকার থেকে বঞ্চিত হচ্ছে নারীরা। যৌন হয়রানি প্রতিরোধে তাই আমাদেরকে রাষ্ট্রীয় উদ্যোগের পাশাপাশি পারিবারিক ও সামাজিকভাবে উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে। এক্ষেত্রে আমরা নিচের করণীয়গুলো বিবেচনা করতে পারি:

১. সামাজিকীকরণে পরিবারের যথাযথ ভূমিকা নিশ্চিত করতে হবে,
২. ধর্মীয় অনুশাসন মেনে চলতে হবে,
৩. ইভ টিজিং প্রতিরোধে সামাজিক আন্দোলন ও প্রতিরোধ জোরদার করতে হবে,
৪. উত্যক্তকারীদের সামাজিকভাবে বয়কট করতে হবে,
৫. নারীর প্রতি ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি গড়ে তুলতে হবে,

ইভ টিজিং

ইভ টিজিং এর প্রতিকার

৬. উত্যক্তকরণ বা যৌন হয়রানি নির্মূলে শিক্ষার্থীদের মধ্যে সচেতনতা সৃষ্টি করতে হবে,
৭. তৃণমূল পর্যায়ে জেন্ডারভিত্তিক বৈষম্য, যৌন হয়রানি সংক্রান্ত বার্তাগুলো পৌঁছানোর উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে,
৮. ইলেক্ট্রনিক ও প্রিন্ট মিডিয়াসহ বিভিন্ন গণমাধ্যমে যৌন হয়রানির বিরুদ্ধে সোচ্চার হতে হবে এবং সামাজিক আন্দোলন গড়ে তোলার ক্ষেত্র প্রস্তুত করতে হবে,
৯. আমাদের পুরুষতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থায় উত্যক্তকারী পুরুষদের 'রোমিও' হিসেবে না দেখে অপরাধী হিসেবে গণ্য করার মানসিকতা গড়ে তুলতে হবে,

ইভ টিজিং

ইভ টিজিং এর প্রতিকার

১০. গণমাধ্যমে বিশেষ করে বিজ্ঞাপন, মিউজিক ভিডিও, সিনেমা ইত্যাদিতে নারীকে 'যৌনবস্তু' হিসেবে উপস্থাপন বন্ধ করতে হবে,
১১. মেয়েদের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সামনে বা রাস্তার মোড়ে বখাটে ছেলেদের আড্ডা বন্ধ করতে হবে,
১২. যৌন হয়রানি প্রতিরোধে কঠোর আইন প্রণয়ন ও প্রয়োগের ব্যবস্থা করতে হবে,
১৩. শিশু ও নারী নির্যাতন আইন ২০০০ কঠোরভাবে প্রয়োগ করতে হবে,
১৪. বখাটে, উচ্ছৃঙ্খল ছেলেদের সুপথে আনতে সার্বক্ষণিক কাউন্সিলিং করতে হবে।

ইভ টিজিং

যৌন হয়রানি ও আইন

বাংলাদেশে যৌন হয়রানির ঘটনা থেকে আত্মহত্যার ঘটনা আশঙ্কাজনক হারে বৃদ্ধি পাচ্ছে। বাংলাদেশে প্রচলিত দণ্ডবিধি আইন-১৮৬০-এর ২৯৪ ধারায় অভিযুক্তের সর্বোচ্চ তিন মাসের কারাদণ্ড, অর্থদণ্ড অথবা উভয়দণ্ডে দণ্ডিত করার বিধান রয়েছে। এ ক্ষেত্রে ৫০৯ ধারায় অভিযুক্ত ব্যক্তির ১ বছর পর্যন্ত বিনাশ্রম কারাদণ্ড, অর্থদণ্ড, অর্থদণ্ড বা উভয় দণ্ডে দণ্ডিত করার বিধান রয়েছে। ঢাকা মহানগরীর পুলিশ অধ্যাদেশ ১৯৭৬-এর ৭৬ ধারায় অভিযুক্ত ব্যক্তির ১ বছর মেয়াদের কারাদণ্ড অথবা ২ হাজার টাকা পর্যন্ত জরিমানা বা উভয় দণ্ডে দণ্ডিত করার বিধান রয়েছে।

নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইন ২০০০-এ 'ইভ টিজিং'-কে যৌন হয়রানির একটি ধরন হিসেবে শাস্তিযোগ্য অপরাধ হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছিল, কিন্তু ইভ টিজিং শব্দটি ব্যবহার করা হয়নি। ২০০৩ সালের সংশোধনী আইনের ৯(ক) ধারায় সর্বোচ্চ ১০ বছর এবং সর্বনিম্ন ৫ বছরের সশ্রম কারাদণ্ড এবং এর অতিরিক্ত অর্থদণ্ডে দণ্ডিত করার বিধান রাখা হয়েছে। এছাড়াও ২০১০ সালের ৯ নভেম্বর থেকে যৌন হয়রানি বন্ধে নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেটদের বিচারিক ক্ষমতা দিয়ে ভ্রাম্যমাণ আদালত আইনে ৫০৯ ধারাটি সংযুক্ত করা হয়েছে। ফলে ম্যাজিস্ট্রেটগণ এ ধারা প্রয়োগ করে অপরাধীকে ঘটনাস্থলে বিচার করে সর্বোচ্চ এক বছরের কারাদণ্ড বা অর্থদণ্ড কিংবা উভয়দণ্ডে দণ্ডিত করতে পারেন।

ইভ টিজিং

যৌন হয়রানি ও আইন

বাংলাদেশের পুলিশ সদর দপ্তরে '৭৩৭৩' নামে একটি অভিযোগ নম্বর চালু করেছে। ফলে আক্রান্ত নারীরা ফোন করে অভিযোগ জানাতে পারেন।

২০০৯ সালের ১৪ মে সুপ্রিম কোর্টের হাইকোর্ট বিভাগ এক যুগান্তকারী রায়ে ইভটিজিংকে যৌন হয়রানি হিসেবে আখ্যায়িত করে নিষেধাজ্ঞা আরোপ করেছেন। এখন প্রয়োজন এই রায়ের যথাযথ বাস্তবায়ন। পাশাপাশি যৌন হয়রানি বা উত্যক্তকরণের ব্যাপারে সুনির্দিষ্ট আইন প্রণয়ন করা। প্রতি বছর শুধু ৮ মার্চ আন্তর্জাতিক নারী দিবসে নয়, বরং এখনই আসুন প্রতিজ্ঞা করি ইভ টিজিং সইবোনা, মানবোনা।

THANK YOU

HSC
একাডেমিক কোর্স

পৌরনীতি ও সুশাসন ২য় পত্র

অধ্যায়ঃ ১০ – নাগরিক সমস্যা ও আমাদের করণীয়

টপিক – ০৫ জলবায়ু পরিবর্তনজনিত সমস্যা

টপিক ০৫: জলবায়ু পরিবর্তনজনিত সমস্যা

This Topic is important for

MCQ	সৃজনশীল
	ক খ
	গ ঘ

জলবায়ু পরিবর্তনজনিত সমস্যা

কোনো স্থানের স্বল্প সময়ের অর্থাৎ ১ দিন থেকে ৭ দিনের বায়ু, তাপ, বৃষ্টিপাত ইত্যাদির গড় অবস্থাকে আবহাওয়া বলে। সাধারণত ৩০ বছরের বেশি সময়ের আবহাওয়ার গড়কেই জলবায়ু বলে। কোনো জায়গার গড় জলবায়ুর দীর্ঘমেয়াদি ও অর্থপূর্ণ পরিবর্তনকে জলবায়ুর পরিবর্তন বলা হয়। জলবায়ু পরিবর্তনজনিত সমস্যা বলতে বিশ্বব্যাপী জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে যে অস্থায়ী কিংবা স্থায়ী নেতিবাচক প্রভাব পড়ছে তাকে বোঝায়। জলবায়ু পরিবর্তনজনিত সমস্যা হলো-বারবার বন্যা, খরা, অতিবৃষ্টি, অনাবৃষ্টি, ঘূর্ণিঝড়, জলোচ্ছ্বাস, সিডর প্রভৃতি প্রাকৃতিক দুর্যোগ, ভূমিক্ষয়, বনাঞ্চল দ্রুত হ্রাস প্রভৃতি। জলবায়ুর পরিবর্তন পৃথিবীর সকল স্থানে ভৌত, প্রাকৃতিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রসহ মানবগোষ্ঠীর জীবন ও জীবন ব্যবস্থার উপর প্রভাব ফেলছে। কিন্তু এ পরিবর্তন নিছক প্রাকৃতিক নয় বরং এর বেশির ভাগই মানুষের সৃষ্টি। মানুষের নিত্যনৈমিত্তিক কর্মকাণ্ড দ্বারা জলবায়ু ব্যাপকভাবে প্রভাবিত হচ্ছে। জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে পাল্টে যাচ্ছে স্বাভাবিক আবহাওয়ার ধরন এবং ঋতু বৈচিত্র্যের আসল রূপ। গঙ্গা, ব্রহ্মপুত্র ও মেঘনার মতো বড় বড় তিনটি নদী অববাহিকার সর্বনিম্নে বাংলাদেশের অবস্থান। বাংলাদেশের ভূখণ্ডের বিশাল অংশ সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে সামান্য উপরে অবস্থিত। এ কারণে জলবায়ু বিপর্যয়জনিত ক্ষতির তালিকায় বাংলাদেশ ঝুঁকিপূর্ণ দেশগুলোর মধ্যে অন্যতম।

জলবায়ু পরিবর্তনজনিত সমস্যা

জলবায়ু পরিবর্তনের কারণ

জলবায়ু পরিবর্তনের মূল কারণ হলো পৃথিবীর উষ্ণায়ন। পৃথিবী উত্তপ্ত হচ্ছে এবং জলবায়ু ক্রমশ পরিবর্তিত হচ্ছে। জলবায়ুর পরিবর্তন ঘটে মূলত দুটি কারণে, যথা- ১. প্রাকৃতিক কারণ ও ২. মনুষ্যসৃষ্ট কারণ। প্রাকৃতিক কারণগুলো হচ্ছে-পৃথিবীর অক্ষরেখা পরিবর্তন, মহাসাগরীয় পরিবর্তন, আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যুৎপাত, সূর্যরশ্মির পরিবর্তন প্রভৃতি।

জলবায়ু পরিবর্তনজনিত সমস্যা

জলবায়ু পরিবর্তনের কারণ

নানা কারণে জলবায়ুর পরিবর্তন ঘটে। এগুলো নিম্নরূপ:

১. বৈশ্বিক উষ্ণায়ন : বর্তমানে বিজ্ঞানী ও গবেষকরা জলবায়ু পরিবর্তনের জন্য মনুষ্যসৃষ্ট কারণকেই মুখ্য বলে প্রকাশ করেছেন। তাঁরা মানুষের দ্বারা উষ্ণতা বৃদ্ধিকারক গ্যাস নিঃসরণের পরিমাণ বৃদ্ধিকে এজন্য দায়ী করেছেন। এ উষ্ণায়নের প্রধান কারণ হচ্ছে উন্নত বিশ্বে ব্যাপকভাবে জীবাশ্ম জ্বালানি, গ্রিন হাউজ গ্যাস প্রভৃতির ব্যবহার। সাধারণত বায়ুমণ্ডলে বিভিন্ন গ্যাস

সূর্যরশ্মির তাপ আটকে রেখে পৃথিবীকে উষ্ণ রাখে। বায়ুর মূল উপাদান অক্সিজেন ও নাইট্রোজেন হলেও এর বাইরে রয়েছে কিছু গ্যাস। এগুলো হলো কার্বন ডাই-অক্সাইড (CO_2), নাইট্রাস অক্সাইড, মিথেন, হ্যালন, জলীয় বাষ্প, ওজোন গ্যাস, ক্লোরো-ক্লোরো-কার্বন (CFC) ইত্যাদি। এগুলো হলো 'গ্রিন হাউজ গ্যাস'। গ্রিন হাউজ মূলত উপরোক্ত গ্যাসের সমন্বয়ে গঠিত একটি আচ্ছাদন। গ্রিন হাউজ গ্যাস পৃথিবীর চারপাশে একটা আবরণ তৈরি করে।

জলবায়ু পরিবর্তনজনিত সমস্যা

জলবায়ু পরিবর্তনের কারণ

এ আবরণ ভেদ করে সূর্যরশ্মি প্রবেশ করতে পারে কিন্তু বের হতে পারে না। এর ফলে ভূ-পৃষ্ঠ সংলগ্ন বায়ুমণ্ডলের উষ্ণতা বৃদ্ধি পায়। একেই বলে 'বৈশ্বিক উষ্ণায়ন' (global warming)। এ উষ্ণায়নের ফলে বায়ুমণ্ডল ও পৃথিবী ক্রমাগত উত্তপ্ত হয়ে উঠছে, সমুদ্র পৃষ্ঠের পানির উচ্চতা ।বাড়ছে। গ্রিন হাউজ প্রতিক্রিয়ার ফলে সৃষ্টি হচ্ছে নানা সমস্যা। বিগত শতাব্দীতে বায়ুমণ্ডলে গ্রিন হাউজ গ্যাসের পরিমাণ বেড়েছে। এ সময়ে কার্বন ডাই-অক্সাইড শতকরা ২৫ ভাগ, নাইট্রাস অক্সাইড শতকরা ১৯ ভাগ এবং মিথেন বেড়েছে ১০০ ভাগ। এর ফলে বৈশ্বিক উষ্ণায়ন বৃদ্ধি পেয়েছে।

জলবায়ু পরিবর্তনজনিত সমস্যা

জলবায়ু পরিবর্তনের কারণ

২. ওজোন স্তরের ক্ষয়: আমাদের ব্যবহার্য রেফ্রিজারেটর, এয়ার কন্ডিশনার, এ্যারোসল, প্লাস্টিক, ফোম ইত্যাদি থেকে বায়ুমণ্ডলে সৃষ্টি হচ্ছে হাইড্রো-ক্লোরো-ক্লোরো কার্বন (HCFC) নামক গ্রিন হাউজ গ্যাস। এ গ্যাসের ফলে বায়ুমণ্ডলের 'ওজোন স্তর' ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। অথচ এ ওজোন স্তরই সূর্যের অতিবেগুনি রশ্মি শোষণ করে পৃথিবীর জীবজগতকে রক্ষা করে।

৩. বৃক্ষ নিধন ও বনভূমি উজাড় : জনসংখ্যা বৃদ্ধি পাবার ফলে ঘরবাড়ি তৈরি, আসবাবপত্র তৈরি, জ্বালানি কাজে ব্যবহার ইত্যাদি কারণে অপরিকল্পিত ও অধিক হারে বৃক্ষ নিধন করা হচ্ছে। এর ফলে বনভূমি উজাড় হচ্ছে এবং কার্বন-ডাই-অক্সাইডের পরিমাণ বৃদ্ধি পাচ্ছে। সাথে সাথে বাড়ছে পৃথিবীর তাপমাত্রা। এর ফলে বরফ গলছে এবং সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধি পাচ্ছে।

৪. অপরিকল্পিত নগরায়ন ও শিল্পায়ন: বিশ্বের উন্নয়নশীল এবং উন্নত দেশগুলোতে জীবাশ্ম জ্বালানি, পারমাণবিক চুল্লি ব্যবহারের হার ক্রমাগত বৃদ্ধি পেয়েই চলেছে। শিল্প কারখানার বর্জ্য ও কালো ধোঁয়া থেকেও নির্গত হচ্ছে প্রচুর পরিমাণে পারদ, সীমা ও আর্সেনিক। সমুদ্রে তেজস্ক্রিয় বর্জ্য নিক্ষেপ করা হচ্ছে। বাংলাদেশে শহরের কাছাকাছি নদী ও খালগুলো ভরাট করে ফেলা হচ্ছে, বর্জ্য ফেলার কাজে ব্যবহৃত হচ্ছে। এর ফলে বায়ু দূষণ ঘটছে। ওজোন স্তরের ক্ষতি হচ্ছে। যানবাহনের নির্গত কালো ধোঁয়া অর্থাৎ কার্বন ডাই-অক্সাইড বায়ুমণ্ডলের ওজোন স্তরকে ক্ষতিগ্রস্ত করছে।

জলবায়ু পরিবর্তনজনিত সমস্যা

জলবায়ু পরিবর্তনের কারণ

৫. কৃষিতে রাসায়নিক দ্রব্যের ব্যবহার: কৃষিতে যান্ত্রিক সেচ, রাসায়নিক সার, কীটনাশক প্রভৃতি ব্যবহারের ফলেও বায়ুমণ্ডলে ওজোন স্তর ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। এর সবকিছুর ফলেই গ্রিন হাউজ গ্যাস বৃদ্ধি পাচ্ছে এবং তা বিশ্বকে উষ্ণ করে তুলছে। বৈশ্বিক উষ্ণায়নের ফলে পৃথিবী ক্রমাগত উত্তপ্ত হবার ফলে সমুদ্র পানির উচ্চতাও বাড়ছে। সুতরাং গ্রিন হাউজ প্রতিক্রিয়ার ফলে সৃষ্টি হচ্ছে নানাবিধ দুর্যোগ ও সমস্যা।

জলবায়ু পরিবর্তনজনিত সমস্যা

জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব

জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে সম্ভাব্য সবচেয়ে ক্ষতিগ্রস্ত দেশের তালিকায় বাংলাদেশের অবস্থান শীর্ষে। বিশেষজ্ঞদের মতে জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে এ শতাব্দীর শেষের দিকে বাংলাদেশের দক্ষিণাঞ্চলের বিস্তীর্ণ সমতল ভূমি পানির নিচে তলিয়ে যাবার আশঙ্কা রয়েছে। ২০৫০ সালের মধ্যে বাংলাদেশের ২০ শতাংশ এলাকা সমুদ্রে তলিয়ে যেতে পারে। জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে বাংলাদেশে নানা রকম প্রভাব দেখা যাচ্ছে। যেমন-

১. গড় তাপমাত্রা বৃদ্ধি : জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে গড় তাপমাত্রা বৃদ্ধি পাচ্ছে। আইপিসিসি-এর চতুর্থ সমীক্ষা রিপোর্ট অনুযায়ী বাংলাদেশের গড় বার্ষিক তাপমাত্রা ১৪ বছরে (১৯৮৫-১৯৯৮) মে মাসে ১ ডিগ্রি এবং নভেম্বর মাসে ০.৫ ডিগ্রি সেলসিয়াস বৃদ্ধি পেয়েছে। বিগত কয়েক বছরে বাংলাদেশে তাপমাত্রার অস্বাভাবিক আচরণ সবাইকে আশঙ্কিত করে তুলেছে।

২. ঋতু পরিবর্তন: বাংলাদেশকে ষড়ঋতুর দেশ বলা হলেও জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে বর্তমানে এখন তিনটি ঋতু অনুভূত হয়। গ্রীষ্ম, বর্ষা এবং শীত। গ্রীষ্মকালে এখন অসহনীয় তাপদাহ। বর্ষাকালে কখনো অতিবৃষ্টি আবার কখনো কম বৃষ্টি। শীতকালে দিনের বেলা তাপমাত্রা বেশি হলেও রাতে তীব্র শৈত্যপ্রবাহ।

জলবায়ু পরিবর্তনজনিত সমস্যা

জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব

৩. বৃষ্টিপাত হ্রাস: জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে বৃষ্টিপাত হ্রাস পাচ্ছে। বাংলাদেশ আবহাওয়া অধিদপ্তর প্রদত্ত তথ্য অনুসারে ২০১০ খ্রিস্টাব্দে যে পরিমাণ বৃষ্টি হয়েছে (৪৭,৪৪৭ মিলিমিটার) তা বিগত ১৫ বছরের মধ্যে সর্বনিম্ন। এর ফলে বাংলাদেশের কৃষিতে এর বিরূপ প্রভাব পড়বে। কৃষককে যান্ত্রিক সেচ ব্যবস্থার ওপর আরো বেশি নির্ভরশীল হতে হবে। তাছাড়া এর ফলে মরুকরণ ঘটবে।

৪. ঘূর্ণিঝড়ের সংখ্যা বৃদ্ধি: জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে বঙ্গোপসাগরে ঘূর্ণিঝড়ের সংখ্যা বেড়ে গেছে। বঙ্গোপসাগরের উপকূলে পূর্বে মাছ ধরার মৌসুমের তিন মাসের মধ্যে আবহাওয়ার একটি সিগন্যাল বা বিপদ সংকেত থাকতো না। কিন্তু ঘূর্ণিঝড়ের সংখ্যা বৃদ্ধি পাওয়ার কারণে এখন প্রত্যেক সপ্তাহে কমপক্ষে একটি সিগন্যাল থাকছে।

৫. অব্যাহত বন্যা : জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে সারা বিশ্বের মতো বাংলাদেশেও বন্যার প্রকোপ বৃদ্ধি পেয়েছে। পূর্ব হিমালয় অঞ্চলে বছরে যত পানি প্রবাহিত হয় তার ৯০ শতাংশের অধিক বাংলাদেশের ওপর দিয়ে প্রবাহিত হয়ে বঙ্গোপসাগরে পড়ে। তাই বাংলাদেশে বন্যার প্রকোপ এমনিতেই বেশি।

জলবায়ু পরিবর্তনজনিত সমস্যা

জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব

৬. লবণাক্ততা বৃদ্ধি : জলবায়ু পরিবর্তন, বৃষ্টিপাত কমে যাবার কারণেও সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতা বেড়ে যাওয়ার কারণে বাংলাদেশের উপকূলীয় এলাকায় লবণাক্ততা অস্বাভাবিক বৃদ্ধি পেয়েছে। এর প্রভাব পড়ছে আমাদের কৃষিতে। লবণাক্ত সহনশীল জাতের শস্য আবাদের কোনো প্রযুক্তি কৃষকদের হাতে না থাকায় তারা চাষাবাদের ক্ষেত্রে অসহায় হয়ে পড়েছেন। লবণাক্ততা বেড়ে যাওয়ায় সুন্দরবনের সুন্দরী গাছে ব্যাপকমাত্রায় আগামরা রোগ দেখা দিয়েছে।। এর ফলে খাদ্যাভাব, বেকারত্ব ও সামাজিক নিরাপত্তাহীনতা বৃদ্ধি পাচ্ছে।

৭. সুপেয় পানির সংকট: সমুদ্র পৃষ্ঠের উচ্চতা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে মিঠা পানির স্বল্পতার কারণে শীতকালে লোনা পানি উপকূল ছাড়িয়ে আরও ভেতরে চলে আসে। স্বাদু পানির আধার যেমন- খাল, বিল ও নদীনালায় লবণাক্ত পানি প্রবেশের ফলে সুপেয় পানির সংকট তৈরি হচ্ছে।

জলবায়ু পরিবর্তনজনিত সমস্যা

জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব

৮. কৃষি উৎপাদনে জটিলতা: জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব সরাসরি পড়ে বাংলাদেশের কৃষিতে। আগাম বন্যা বা দেরিতে বন্যা হওয়ার কারণে আউশ ও আমন ফসলগুলো আবাদে সমস্যা হচ্ছে। কখনো কখনো সমস্ত ফসলই নষ্ট হয়ে যাচ্ছে।

৯. জীব বৈচিত্র্য ধ্বংস: জলবায়ু পরিবর্তনজনিত কারণে খাদ্যশৃঙ্খল ও জীব বৈচিত্র্য ধ্বংসের মুখে পড়েছে। অনেক ম্যানগ্রোভ বন, উদ্ভিদ লবণাক্ততা সহ্য করতে না পেরে বিপন্ন হয়ে পড়েছে। বাংলাদেশের বিশ্ব-ঐতিহ্য সুন্দরবনের জীব বৈচিত্র্য ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে। উপকূলীয় অঞ্চলে মিঠা পানির মাছ হারিয়ে যাচ্ছে। জমির উর্বরা শক্তি হ্রাস পাচ্ছে। গাছপালা ধ্বংস হচ্ছে।

১০. বৃষ্টিপাত হ্রাস : জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে ভারত ও বাংলাদেশসহ আশেপাশে বৃষ্টিপাতের পরিমাণ হ্রাস পাচ্ছে। এর নেতিবাচক প্রভাব পড়ছে কৃষি ও মৎস্য সম্পদের ক্ষেত্রে।

জলবায়ু পরিবর্তনজনিত সমস্যা

জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব

১১. মরুকরণ : বাংলাদেশে দিন দিন বৃষ্টিপাতের পরিমাণ কমে যাচ্ছে। সময়মতো বন্যা হচ্ছে না। এর ফলে ভূগর্ভস্থ পানির স্তর নেমে যাচ্ছে। বাংলাদেশ খরায় আক্রান্ত হচ্ছে। সৃষ্টি হচ্ছে মেরুকরণ। অনাবৃষ্টি, বৃষ্টিপাতের পরিমাণ হ্রাস এবং ফারাক্কা বাঁধকে দায়ী করা হচ্ছে।

১২. প্রাকৃতিক দুর্যোগ বৃদ্ধি: জলবায়ুর পরিবর্তনের ফলে প্রাকৃতিক দুর্যোগের প্রকোপ বৃদ্ধি পেয়েছে। বাংলাদেশ বিশ্বের সব থেকে দুর্যোগপ্রবণ এলাকাগুলোর একটি। বাংলাদেশে ঘূর্ণিঝড়, জলোচ্ছ্বাস, সাইক্লোন, টর্নেডো প্রভৃতি দুর্যোগের মাত্রা বৃদ্ধি পাচ্ছে। ২০০৭ খ্রিস্টাব্দের ঘূর্ণিঝড়, সিডর, ২০০৮ খ্রিস্টাব্দের ঘূর্ণিঝড় নার্গিস, ২০০৯ খ্রিস্টাব্দের ২৫ মে ঘূর্ণিঝড় আইলা বাংলাদেশ এবং পার্শ্ববর্তী কয়েকটি দেশে মারাত্মক ক্ষতি সাধন করে।

১৩. হিমবাহ: পরিবেশ বিজ্ঞানীরা মনে করেন জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে পার্বত্য এলাকায় হিমবাহের সৃষ্টি হচ্ছে। এর ফলে বরফ গলছে, চূর্ণবিচূর্ণ হচ্ছে এবং অতি বৃষ্টির ও বন্যার সৃষ্টি হচ্ছে।

১৪. নদনদীর গতিপ্রবাহ পরিবর্তন: জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে নদনদীর গতিপথ পরিবর্তিত হচ্ছে, নাব্যতা হ্রাস পাচ্ছে।

১৫. সংক্রামক ব্যাধির বিস্তার: জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে নতুন নতুন রোগের সৃষ্টি হচ্ছে, সংক্রামক ব্যাধির প্রকোপ বাড়ছে। এর ফলে জনস্বাস্থ্য ঝুঁকির মধ্যে পড়ছে।

জলবায়ু পরিবর্তনজনিত সমস্যা

জলবায়ু পরিবর্তনজনিত সমস্যা মোকাবেলায় করণীয়

জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে যে ভয়াবহ আর্থ-সামাজিক ও পরিবেশগত বিপর্যয়ের মুখোমুখি হয়েছে আজ সমগ্র বিশ্ব তা থেকে বাঁচতে হলে যা করতে হবে তা নিম্নরূপ:

ক. আন্তর্জাতিক পর্যায়ে করণীয়

১. আর্থ-সামাজিক ও পরিবেশগত বিপর্যয়ের সাথে খাপ-খাওয়ানোর লক্ষ্যে পথ ও কর্মসূচি গ্রহণ করতে হবে,

২. পরিবেশ দূষণ সম্পর্কে বিশ্ববাসীকে সচেতন করে তুলতে হবে,

৩. জলবায়ু পরিবর্তন-উদ্ভূত পরিস্থিতি মোকাবেলার জন্য বিশ্বের সর্বত্রই মানবদক্ষতা ও প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা বৃদ্ধি করতে

৪. শিল্প উন্নত দেশগুলোতে গ্রিন হাউজ গ্যাস উৎসারণ আরো কমিয়ে আনতে হবে,

৫. যেহেতু উন্নত দেশসমূহ মনুষ্যসৃষ্ট জলবায়ু পরিবর্তনের জন্য দায়ী তাই তাদেরকেই এর অভিঘাত মোকাবেলায় বাংলাদেশসহ ভুক্তভোগী অন্যান্য দরিদ্র দেশকে অর্থ ও প্রযুক্তি দিয়ে সাহায্য করতে হবে,

জলবায়ু পরিবর্তনজনিত সমস্যা

জলবায়ু পরিবর্তনজনিত সমস্যা মোকাবেলায় করণীয়

৬. জলবায়ু পরিবর্তনের অভিঘাত মোকাবেলা এবং ভুক্তভোগী দেশগুলোকে আর্থিক ও প্রযুক্তিগত সহযোগিতা প্রদানের জন্য উপযোগী আন্তর্জাতিক সমঝোতা চুক্তি স্বাক্ষর করতে হবে,
হবে।

৭. পৃথিবীর যে দেশেই জলবায়ু পরিবর্তনজনিত অভিঘাত সৃষ্টি হোক সমগ্র বিশ্বকেই তা মোকাবেলায় এগিয়ে আসতে হবে।

জলবায়ু পরিবর্তনজনিত সমস্যা

জলবায়ু পরিবর্তনজনিত সমস্যা মোকাবেলায় করণীয়

খ. জলবায়ু পরিবর্তনজনিত সমস্যা মোকাবেলায় বাংলাদেশের একজন নাগরিকের করণীয়

১. বন পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষা করে। এজন্য চারপাশে বিশেষ করে উপকূলে বনায়ন করতে হবে,

২. উপকূলে সিডর, আইলা, ঘূর্ণিঝড়, জলোচ্ছ্বাস ও বন্যা প্রবণতা মোকাবেলায় সক্ষম কৃষিশস্য অভিযোজন করতে হবে,

৩. উপকূলে শক্ত ও টেকসই বাঁধ নির্মাণ করতে হবে,

৪. উপকূলীয় এলাকায় মাছের চাষ যেন নষ্ট না হয় সেজন্য ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে,

৫. জলোচ্ছ্বাসের ফলে পানি যেন কোনো এলাকায় দীর্ঘদিন ধরে আটকে না থাকে সেজন্য দ্রুত পানি নিষ্কাশনের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে,

৬. পানি ব্যবস্থাপনা সংস্থাসমূহের সামর্থ্য বৃদ্ধি করতে হবে,

৭. উপকূলীয় জনগণের জন্য নিরাপদ সুপেয় পানীয় জলের ব্যবস্থা করতে হবে,

৮. প্রাকৃতিক দুর্যোগে বিপর্যস্ত মানুষের জন্য বিমার ব্যবস্থা করতে হবে,

৯. খরা, বন্যা ও লবণাক্ততা কাটিয়ে ওঠার কৌশল, পদ্ধতি বা উপায় খুঁজে বের করার জন্য গবেষণা কাজ চালাতে হবে,

১০. প্রাকৃতিক দুর্যোগের আভাষ বা সতর্ক সংকেত ব্যবস্থা জোরদার করতে হবে,

জলবায়ু পরিবর্তনজনিত সমস্যা

জলবায়ু পরিবর্তনজনিত সমস্যা মোকাবেলায় করণীয়

১১. উপকূল এলাকায় আরো বেশি আশ্রয়কেন্দ্র নির্মাণ করতে হবে,
১২. কৃষি উৎপাদনে জীববৈচিত্র্য রক্ষার নীতি গ্রহণ করতে হবে,
১৩. অপ্রয়োজনে সার ও কীটনাশক ব্যবহার করা যাবে না,
১৪. স্বাভাবিক পানি প্রবাহ বন্ধ করা যাবে না,
১৫. জলাধার নির্মাণ ও সংরক্ষণ করতে হবে,
১৬. বনজ সম্পদ বাড়াতে হবে এবং দেশে আরও বন সৃষ্টি করতে হবে,
১৭. জালানি হিসেবে কাঠের ব্যবহার বা জীবাশ্ম জ্বালানির ব্যবহার বন্ধ করতে হবে,
১৮. জীব বৈচিত্র্য রক্ষার জন্য সরকারি ও ব্যক্তি পর্যায়ে সর্বোচ্চ সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে,
১৯. ইট ভাটা, শিল্প কারখানা ও যানবাহনের বিষাক্ত কালো ধোঁয়া নিয়ন্ত্রণ করতে হবে,
২০. জনসংখ্যা কমিয়ে আনতে হবে,
২১. পরিকল্পিত শিল্পায়ন ও নগরায়ন করতে হবে,
২২. পরিকল্পিত বর্জ্য ব্যবস্থাপনা গড়ে তুলে পরিবেশ দূষণ কমাতে হবে।

THANK YOU

HSC
একাডেমিক কোর্স

পৌরনীতি ও সুশাসন ২য় পত্র

অধ্যায়ঃ ১০ – নাগরিক সমস্যা ও আমাদের করণীয়

টপিক – ০৬ এইডস

টপিক ০৬: এইডস

This Topic is important for

MCQ	সৃজনশীল
	ক খ
	গ ঘ

এইডস

ধারণা

অনেক কঠিন রোগের কথা আমরা শুনেছি। যেমন যক্ষ্মা, ক্যান্সার প্রভৃতি। এক সময় বলা হতো 'যার হয় যক্ষ্মা তার নাই রক্ষা'। কিন্তু এখন সময়মতো চিকিৎসা করালে এ রোগ সম্পূর্ণ ভালো হয়ে যায়। এছাড়া এ রোগ প্রতিরোধের জন্য টিকাও বের হয়েছে। ক্যান্সারও প্রাথমিক পর্যায়ে শনাক্ত হলে নিরাময় সম্ভব। কিন্তু বর্তমান সময়ে সব থেকে আতঙ্ক সৃষ্টি করেছে এইডস নামক এক মরণব্যাধি। ইংরেজি "Acquired Immuno Deficiency Syndrome" শব্দগুলোর প্রত্যেকটির প্রথম অক্ষর নিয়ে 'AIDS' শব্দটি গঠিত হয়েছে। এইডস এক ধরনের ভাইরাসজনিত রোগ। এইচআইভি (HIV) নামক এক ধরনের ভাইরাসের দ্বারা আক্রান্ত হলে ‘‘এইডস’’ রোগ-এর সৃষ্টি হয়। (HIV)-এর পূর্ণাঙ্গ রূপ হলো ‘‘Human Immuno deficiency Virus" অর্থাৎ যে ভাইরাস মানুষের শরীরের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা কমিয়ে দেয় তাই এইচআইভি (HIV)।

এইডস

ধারণা

অনেক কঠিন রোগের কথা আমরা শুনেছি। যেমন যক্ষ্মা, ক্যান্সার প্রভৃতি। এক সময় বলা হতো 'যার হয় যক্ষ্মা তার নাই রক্ষা'। কিন্তু এখন সময়মতো চিকিৎসা করালে এ রোগ সম্পূর্ণ ভালো হয়ে যায়। এছাড়া এ রোগ প্রতিরোধের জন্য টিকাও বের হয়েছে। ক্যান্সারও প্রাথমিক পর্যায়ে শনাক্ত হলে নিরাময় সম্ভব। কিন্তু বর্তমান সময়ে সব থেকে আতঙ্ক সৃষ্টি করেছে এইডস নামক এক মরণব্যাধি। ইংরেজি "Acquired Immuno Deficiency Syndrome" শব্দগুলোর প্রত্যেকটির প্রথম অক্ষর নিয়ে 'AIDS' শব্দটি গঠিত হয়েছে। এইডস এক ধরনের ভাইরাসজনিত রোগ। এইচআইভি (HIV) নামক এক ধরনের ভাইরাসের দ্বারা আক্রান্ত হলে ‘‘এইডস’’ রোগ-এর সৃষ্টি হয়। (HIV)-এর পূর্ণাঙ্গ রূপ হলো ‘‘Human Immuno deficiency Virus" অর্থাৎ যে ভাইরাস মানুষের শরীরের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা কমিয়ে দেয় তাই এইচআইভি (HIV)।

এইডস

ধারণা

এইচআইভি/এইডস-এর উদ্ভব ও বিস্তার

যতদূর জানা যায়, এইডস-এর উদ্ভব ঘটে সর্বপ্রথম আফ্রিকাতে, ১৯৩০ সালের দিকে। তবে তা সীমিত ছিল কিছু গোত্রের মধ্যে। ১৯৫০-এর দশকে এ রোগ সম্পর্কে অনেকে জানতে পারে। মনে করা হয় যে, মানবদেহে এইচআইভি ভাইরাস/এইডস-এর উদ্ভব ঘটে আফ্রিকার ক্যামেরুনে।

১৯৮১ সালে আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের নিউইয়র্ক, ক্যালিফোর্নিয়া অঞ্চলে বিশেষ করে লসএঞ্জেলসে সর্বপ্রথম এইডস রোগীর সন্ধান পাওয়া যায়। লসএঞ্জেলসে ৫ জন যুবককে এইচআইভি/এইডস আক্রান্ত রোগী হিসেবে শনাক্ত করা হয়। এরা সকলেই ছিল সমকামী এবং নিউমোনিয়ায় আক্রান্ত। আবার কিছুদিন পর কিছু এইডস আক্রান্ত রোগী পাওয়া গেল যারা নিউমোনিয়ায় আক্রান্ত হলেও সমকামী নয়। সারা বিশ্বে এ রোগ নিয়ে হৈ চৈ পড়ে যায়। শুরু হয় এ রোগ নিয়ে প্রচুর লেখালেখি ও গবেষণা।

এইডস

ধারণা

১৯৮২ সালের পর এ মরণব্যাধি ছড়িয়ে পড়ে পশ্চিম ইউরোপের দেশগুলিতে। এরপর তা ছড়িয়ে পড়ে অস্ট্রেলিয়া এবং থাইল্যান্ডে। ১৯৮৩ সালে ফ্রান্সের রাজধানী প্যারিসে এইডস আক্রান্ত রোগী এবং তার শরীরে বিশেষ ধরনের ভাইরাস খুঁজে পাওয়া যায়। ১৯৮৩ সালে ফরাসি গবেষক অধ্যাপক লুক মন্টেগনিয়ার এবং ১৯৮৪ সালে আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের গবেষক ড. রবার্ট গ্যালো গবেষণা করে আবিষ্কার করলেন যে, ভাইরাস এইচআইভি টাইপ-১ থেকে এইডস (AIDS) এর উদ্ভব ঘটেছে। ১৯৮৫ সালে এ রোগের কারণ এবং এর চিকিৎসা নিয়ে ব্যাপক পরীক্ষা-নিরীক্ষা শুরু হয়। এ সময় এ রোগ নির্ণয়ের ক্ষেত্রে 'এলিজা' নামে একটি পরীক্ষাও আবিষ্কৃত হয়। ১৯৮৬ সালে পশ্চিম আফ্রিকার এইডস রোগীদের ওপর গবেষণা চালিয়ে HIV টাইপ-২ শনাক্ত করা হয়। এ রোগ এবং এর প্রতিকার নিয়ে শুরু হয় পরীক্ষা-নিরীক্ষা ও গবেষণা।

আশঙ্কার কথা এই যে, এই মরণব্যাধি এখন আফ্রিকা, পশ্চিম ইউরোপ এবং আমেরিকা ছাড়িয়ে প্রবেশ করেছে এশিয়ার দেশগুলিতেও। ১৯৮৬ সালে ভারত এবং মিয়ানমারে এবং ১৯৮৯ সালে বাংলাদেশেও এ মরণব্যাধি শনাক্ত হয়েছে। সারাবিশ্বে লাখ লাখ মানুষ এখন এই মরণব্যাধিতে আক্রান্ত।

এইডস

বাংলাদেশে এইডস এর প্রভাব

বাংলাদেশে ১৯৮৯ সালে সর্বপ্রথম HIV আক্রান্ত বা AIDS রোগী শনাক্ত হয়।

বাংলাদেশে এইডস আক্রান্ত রোগীর সংখ্যা পাওয়া খুবই দুরূহ। কেননা সামাজিক কারণে এইডস আক্রান্ত রোগী বা তার আত্মীয়স্বজন তা প্রকাশ করে না। তবে সরকারি পরিসংখ্যান অনুসারে ২০০৬ সাল পর্যন্ত বাংলাদেশে মোট ৭৩৬ জন এইডস রোগীর সন্ধান পাওয়া গেছে। সরকারি তথ্য মতে ২০১০ সালে প্রায় ২৪১ জন এইডস রোগী মারা গিয়েছিল এবং HIV ভাইরাস আক্রান্ত ছিল ৭৫০০ জন। তবে বেসরকারি গবেষকদের মতে, এ সংখ্যা আরও অনেক বেশি। জাতিসংঘ প্রদত্ত রিপোর্ট অনুযায়ী বাংলাদেশে HIV আক্রান্ত লোকের সংখ্যা বর্তমানে আনুমানিক ১১ হাজার বলে জানানো হয়েছে, যা আমাদের মোট জনসংখ্যার ০.১ শতাংশেরও কম।

বাংলাদেশের মোট জনসংখ্যার এক-চতুর্থাংশ হচ্ছে ১০ থেকে ১৯ বছর বয়সী কিশোর-কিশোরী। বয়সঃসন্ধিকালে কিশোর-কিশোরীদের শারীরিক ও মানসিক পরিবর্তনের ফলে তাদের চিন্তা এবং আচরণে অনেক কৌতূহল জন্মে।

বাংলাদেশে এইডস এর প্রভাব

পরিবারের বড়দের কাছে এ সব বিষয়ে কোনো প্রশ্ন করতে পারে না। তাই তারা অনেক বেশি আবেগপ্রবণ থাকে এবং কখনো কখনো কৌতূহল নিরসন করতে অনেকেই অনিরাপদ দৈহিক সম্পর্ক স্থাপনে আগ্রহী হয়ে ওঠে। এ রকম পরিস্থিতিতেই সঠিক জ্ঞানের অভাবে অধিকাংশ কিশোর ও যুববয়সীরা এইচ.আই.ভি সংক্রমণের ঝুঁকিতে পড়ে যায়। বাংলাদেশের মতো একটি উন্নয়নশীল দেশের বিরাজমান আর্থ-সামাজিক কাঠামোতে নারীর দুর্বল অবস্থান, প্রজনন স্বাস্থ্য শিক্ষার অভাব, অল্প বয়সে বিয়ে, পুরুষের আধিপত্য, নারী-পুরুষের সম্পর্কের ক্ষেত্রে নারীদের গৌণ ভূমিকা, অনৈতিক ও অনিরাপদ যৌন সম্পর্কে বাধা দানে নারীদের ক্ষমতার অভাব ইত্যাদি কারণে পুরুষের তুলনায় নারীরা এদেশে এইচ.আই.ভি সংক্রমণের ক্ষেত্রে অধিকতর ঝুঁকিতে রয়েছে।

এইডস

কীভাবে এইচ. আই. ভি ছড়ায় বা এইডস এর বিস্তার ঘটে

১. এইচ.আই.ভি দ্বারা আক্রান্ত ব্যক্তির রক্ত গ্রহণ করলে,
২. ইন্জেকশনের একই সুচ ও সিরিঞ্জ একাধিক ব্যক্তি ব্যবহার করলে কিংবা অপরিশোধিত অবস্থায় ব্যবহৃত হলে,
৩. এইচ.আই.ভি সংক্রমিক মায়ের দুধ পানের মাধ্যমে,
৪. এইচ.আই.ভি এবং এইডস আক্রান্ত কোনো নারী বা পুরুষের সাথে অন্য কোনো সুস্থ নারী বা পুরুষের অনিরাপদ দৈহিক মিলনের ফলে,
৫. এইচ.আই.ভি সংক্রমিত অঙ্গ (যেমন- হৃদপিণ্ড, কিডনি, কর্ণিয়া ইত্যাদি) বা কোষসমষ্টি কোনো সুস্থ ব্যক্তির দেহে প্রতিস্থাপন করলে,
৬. এইচ.আই.ভি সংক্রমিত রোগীর ক্ষেত্রে ব্যবহৃত অপারেশনের যন্ত্রপাতি জীবাণুমুক্ত না করে ব্যবহার করলে,
৭. এইচ.আই.ভি এবং এইডস-এ আক্রান্ত মায়ের মাধ্যমে শিশু গর্ভাবস্থায়, প্রসবের সময়, মায়ের দুধ পানের মাধ্যমে সংক্রমিত হতে পারে।

এইচ. আই. ভি ছড়ানো সম্পর্কে প্রচলিত ভ্রান্ত ধারণা

এমন ভ্রান্ত ধারণা প্রচলিত রয়েছে যে-

১. এইচ.আই.ভি একটি ছোঁয়াচে ভাইরাস,
২. এইচ.আই.ভি ভাইরাস হাঁচি বা কাশির মাধ্যমে ছড়ায়,
৩. খাদ্য ও পানির মাধ্যমে ছড়ায়,
৪. মশার কামড়ে ছড়ায়,
৫. একই পুকুর, গোসলখানা বা বাথরুম, টয়লেট ব্যবহারের ফলে ছড়ায়,
৬. একই সাথে খাবার খেলে ছড়ায়,
৭. একই সাথে কাজ করলে ছড়ায়,
৮. একই সাথে ঘুমালে ছড়ায়,
৯. হাত মেলালে ছড়ায়,
১০. কোলাকুলি করলে ছড়ায়।

এইডস

এইডস এর লক্ষণসমূহ

এইডস-এর নির্দিষ্ট কোনো লক্ষণ নেই। তবে এইডস আক্রান্ত ব্যক্তিদের মধ্যে বেশ কিছু সুযোগ সন্ধানী রোগের লক্ষণ দেখা দেয়; এগুলো নিম্নরূপ:

১. এইচ.আই.ভি সংক্রমণের কয়েক সপ্তাহের মধ্যে হাল্কা জ্বর, গলা ব্যথা, র‍্যাস ও ম্যাজম্যাজ ভাব দেখা দেয়,

২. দুই থেকে তিন মাসের মধ্যে শরীরের ওজন দ্রুত হ্রাস পায়,

৩. দুই মাসের বেশি সময় ধরে পুনঃ পুনঃ জ্বর হয় এবং রাতে শরীরে অতিরিক্ত ঘাম হয়,

৪. দুই মাসের বেশি সময় ধরে পাতলা পায়খানা হতে থাকে,

৫. শরীরের বিভিন্ন স্থানে ছত্রাকজনিত সংক্রমণ দেখা দেয়,

৬. গলা, বগল ও কুচকির লসিকা গ্রন্থি (Lymph Node) ফুলে ওঠে,

৭. অতিরিক্ত অবসাদগ্রস্ত হয়ে পড়ে,

এইডস

এইডস এর লক্ষণসমূহ

৮. দীর্ঘদিন ধরে শুকনো কাশি লেগে থাকে,
৯. রোগীর সমস্ত শরীরে অস্বাভাবিক চুলকানি দেখা দেয়,
১০. মুখ ও গলায় একধরনের ঘা হয় এবং তা থেকে ফেনাযুক্ত রস বের হয়,
১১. হজমশক্তি হ্রাস পায়, মেয়াদি
১২. কৃমির প্রভাব দেখা দেয়।

এইডস

এইডস আক্রান্তদের প্রতি আমাদের আচরণ কেমন হবে?

এইডস আক্রান্ত ব্যক্তির একদিকে যেমন একটি পরিবারের সদস্য, তেমনি তিনি সমাজেরও একজন সদস্য। তাদের প্রতি আমাদের আচরণ ও মনোভাব হওয়া উচিত আন্তরিক ও সৌহার্দ্যপূর্ণ :

১. তাদের প্রতি আমাদের আচরণ ও মনোভাব হবে ইতিবাচক, আন্তরিক ও সৌহার্দ্যপূর্ণ,

২. তাদের প্রতি হতে হবে সহানুভূতিশীল ও যত্নবান,

৩. তাদেরকে মানসিকভাবে প্রফুল্ল রাখার চেষ্টা করতে হবে,

৪. অন্য সকলের মতো তাদেরকেও সমান সুযোগ-সুবিধা প্রদান করতে হবে,

৫. তাদের প্রতি বৈষম্যমূলক মনোভাব পোষণ বা প্রদর্শন করা যাবে না,

৬. তাদেরকে চাকরি ও অন্যান্য কাজ থেকে বঞ্চিত করা যাবে না,

৭. তাদের সুচিকিৎসার ব্যবস্থা গ্রহণে পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্রকে এগিয়ে আসতে হবে,

৮. এইডস রোগীদের পরিচর্চার সময় স্বাভাবিক আচরণ করতে হবে,

৯. এইডস রোগীদের সাথে বসবাস, খাওয়া দাওয়া, আসবাবপত্রের ব্যবহার ইত্যাদি সকল ক্ষেত্রে সাধারণ রোগীদের মতোই সহানুভূতিশীল মনোভাব প্রদর্শন করতে হবে।

এইডস প্রতিরোধ

মরণব্যাধি এইডস প্রতিরোধে পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে যত্নবান হওয়ার প্রয়াস চালাতে হবে। এক্ষেত্রে নিম্নলিখিত বিষয়ে পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে।

১. পারিবারিক মূল্যবোধ রক্ষা করতে হবে,

২. দাম্পত্য জীবনে বিশ্বস্ত থাকতে হবে এবং অশান্তি এড়িয়ে চলতে হবে,

৩. যৌনাচারের ক্ষেত্রে সংযম প্রদর্শন করতে হবে। সব ধরনের অনৈতিক ও বিকৃত যৌনাচার পরিহার করতে হবে,

৪. ধর্মীয় মূল্যবোধ ও নৈতিকতার প্রতি শ্রদ্ধাশীল হতে হবে,

৫. যৌনমিলনে নিরাপদ পদ্ধতি গ্রহণ করতে হবে,

৬. রক্তগ্রহণের ক্ষেত্রে সাবধানতা অবলম্বন করতে হবে। HIV সংক্রমণ ঘটেছে এরূপ লোকের রক্ত যেন গ্রহণ করা না হয় সেজন্য যথাযথভাবে পরীক্ষার পর রক্ত গ্রহণ করতে হবে,

৭. ইনজেকশনের সিরিঞ্জ দ্বিতীয়বার ব্যবহার করা চলবে না,

৮. সূঁচ-সিরিঞ্জ জীবাণুমুক্ত করে ব্যবহার করতে হবে,

৯. এইডস আক্রান্তদের সন্তান গ্রহণ থেকে বিরত থাকতে হবে বা রাখতে হবে,

১০. এইডস রোগীদের সম্পর্কে আমাদের সহানুভূতিশীল, আন্তরিক ও সৌহার্দ্যপূর্ণ আচরণ করতে হবে,

এইডস

এইডস প্রতিরোধ

১১. মাদকদ্রব্য সেবন থেকে বিরত থাকতে হবে,
১২. এইডস রোগ নির্ণয় ব্যবস্থা সুলভ ও সহজলভ্য করতে হবে,
১৩. সমকামিতার কুফল সম্পর্কে প্রচার-প্রচারণা চালাতে হবে,
১৪. এইডস সম্পর্কে জনগণকে সচেতন করার জন্য রেডিও, টেলিভিশন, সংবাদপত্রসহ প্রচার মাধ্যমসমূহে প্রচারণা জোরদার করতে হবে,
১৫. বিশ্ব এইডস দিবস পালন: প্রতি বছর ১ ডিসেম্বর 'বিশ্ব এইডস দিবস' পালন করতে হবে এবং এইডস-এর কূফল সম্পর্কে প্রচার-প্রচারনা চালাতে হবে।

এইডস প্রতিরোধে ধর্মীয় নেতৃবৃন্দের ভূমিকা

বিশ্বের সকল ধর্মেই বহুগামিতা, ব্যভিচার, নেশা ইত্যাদিকে নিষিদ্ধ করা হয়েছে। পরিচ্ছন্ন জীবন গঠন, অজ্ঞতা পরিহার, সব ধরনের রোগ মহামারী থেকে কীভাবে নিজেকে রক্ষা করতে হবে এ সম্পর্কে বিশ্বের সকল ধর্মগ্রন্থেই উল্লেখ রয়েছে। বিশেষ করে কোরআন ও হাদীসে (সূরা বনী ইসরাইল, আয়াত-৩২; সূরা নূর, আয়াত-৩০; সূরা আল-বাকারা, আয়াত-১৯৫; সূরা আরাফ, আয়াত-৮২; সূরা তওবা, আয়াত-১৮৮; এবং বুখারী শরীফ) ইত্যাদিতে অনেক রোগ ব্যাধি ও বিশেষ আপদ-বিপদ সম্পর্কে আমাদেরকে সতর্ক করা হয়েছে। এইডস প্রতিরোধে বিশ্বের অনেক দেশেই ধর্মীয় মূল্যবোধ ও বিশ্বাসকে সফলভাবে কাজে লাগানো হয়েছে।

আমাদের দেশের মানুষ সহজ, সরল ও ধর্মভীরু। মসজিদ, মন্দির, গীর্জা, প্যাগোডা ইত্যাদি এদেশের মানুষের জীবনে দীর্ঘকাল থেকে ধর্মীয় বিশ্বাস, মূল্যবোধ, সংস্কৃতি ও জ্ঞানের প্রসারে সহায়তা করে আসছে। এসব ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানে ধর্মীয় ও সামাজিক সমস্যা নিয়ে আলোচনা করা হয়। এসব ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান সর্বস্তরের মানুষের মধ্যে ভাবের এবং তথ্য আদান-প্রদানের একটি শক্তিশালী সামাজিক ও ধর্মীয় মাধ্যম হিসেবে কাজ করছে।

এইডস প্রতিরোধে ধর্মীয় নেতৃবৃন্দের ভূমিকা

আমাদের দেশে মসজিদের ইমাম, মন্দিরের পুরোহিতগণ এইডস প্রতিরোধে সচেতনতা সৃষ্টিতে মূল্যবান ভূমিকা পালন করতে পারেন। সরকারের ধর্ম মন্ত্রণালয় ইতোমধ্যেই ইমাম প্রশিক্ষণ কর্মসূচিতে এইচ.আই.ভি এবং এইডস বিষয়টিকে অন্তর্ভুক্ত করেছে।

আমরা প্রত্যেকেই বাঁচার মতো বাঁচতে চাই। নিছক দিনযাপনের জন্য প্রাণ ধারণ করতে চাই না। তাই চাই নীরোগ সুস্থ সবল দেহ, শঙ্কাহীন মন, চাই 'আনন্দ উজ্জ্বল পরমায়ু'। এইডস এর মতো আতঙ্কজনক ঘাতক ব্যাধির প্রতিরোধের মাধ্যমে আমরা আমাদের কাঙ্ক্ষিত আনন্দময় জীবন পেতে পারি। এজন্য প্রয়োজন সচেতনতা ও সুচিন্তিত রাষ্ট্রীয় উদ্যোগ।

THANK YOU

HSC
একাডেমিক কোর্স

পৌরনীতি ও সুশাসন ২য় পত্র

অধ্যায়ঃ ১০ – নাগরিক সমস্যা ও আমাদের করণীয়

টপিক – ০৭ বহুনির্বাচনী প্রশ্ন সমাধান

বহুনির্বাচনী প্রশ্ন সমাধান

১। 'বিশেষ চাহিদার জনগোষ্ঠী' কারা? [ঢা. বো. ২০১৯, ২০১৬; ব. বো. ২০২১; চ. বো. ২০১৯; দি. বো. ২০২৩]

ক. উপজাতি খ. ভিক্ষুক গ. ভূমিহীন ঘ. প্রতিবন্ধী

২।বিশেষ চাহিদার জনগোষ্ঠী কারা?[সি. বো. ২০২২]

ক. ছিন্নমূল খ. ভূমিহীন গ. প্রতিবন্ধী ঘ. পথশিশু

৩।বয়স, লিঙ্গ, জাতি, সংস্কৃতি বা সামাজিক অবস্থান অনুযায়ী আর দশজন যে কাজগুলো করতে পারে ইমপেয়ারমেন্টের কারণে সে কাজগুলো প্রাত্যহিক জীবনে করতে না পারার অবস্থাটাই হলো ডিসএবিলিটি বা প্রতিবন্ধিতা'- সংজ্ঞাটি প্রদান করেছে-

ক. উইকিপিডিয়া খ. Social work Dictionary

গ. Oxford Dictionary ঘ. Encyclopaedia Britanica

৪। প্রতি বছর কোন্ তারিখ 'বিশ্ব প্রতিবন্ধী দিবস' হিসেবে পালিত হয়? [রা বো. ২০২১; য. বো. ২০২২; ম. বো. ২০২৩]

ক. ১ ডিসেম্বর খ. ২ ডিসেম্বর গ. ৩ ডিসেম্বর ঘ. ৪ ডিসেম্বর

৫। বিশ্বের শতকরা কত ভাগ মানুষ প্রতিবন্ধিতার সমস্যায় আক্রান্ত? (ঢা. বো. ২০২২; কু. বো. ২০২২]

ক. ১০ খ ১২ গ. ১৪ ঘ. ১৬

৬। বাংলাদেশ সরকার প্রতিবন্ধীদের কত টাকা করে ভাতা দেয়?
ক. ১০০ টাকা খ. ২০০ টাকা গ. ৩০০ টাকা ঘ. ৪০০ টাকা

৭।একটি দুর্ঘটনায় রহিম তার দুটো পা-ই হারিয়েছে। তার জীবনটা এখন আর স্বাভাবিক নয়। সে বিভিন্নভাবেই অধিকার বঞ্চিত এবং অসহায়। রহিমের স্বাভাবিক জীবনের জন্য প্রয়োজন- [য. বো. ২০১৬]

i. আর্থিক অনুদান
ii. কর্মের সুযোগ
iii. বিশেষ সহযোগিতা ও সুবিধা

নিচের কোন্টি সঠিক?
ক. i ও ii খ. Iii গ. ii ও iii ঘ. i, ii ও iii

৮। প্রতিবন্ধীদের সমস্যা সমাধানে সর্বাগ্রে কীসের প্রয়োজন?[চ. বো. ২০২২]
ক. প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা খ. ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি
গ. আর্থিক সহায়তা ঘ. সামাজিক নিরাপত্তা

নিচের উদ্দীপকটি পড়ো এবং ৯ ও ১০ নং প্রশ্নের উত্তর দাও :

মিসেস 'ক' তাঁর ক্লাসের অন্যসব ছাত্রছাত্রীদের তুলনায় প্রতিবন্ধী ছাত্র-ছাত্রীদের সকল ক্ষেত্রেই অগ্রাধিকার দিয়ে থাকেন। ক্লাসের পড়া দেয়া-নেয়া ও প্রথম সারির আসনে বসার সুযোগ প্রদানসহ যাবতীয় ব্যাপারে তাদের চাওয়া-পাওয়াকে সর্বাগ্রে বিবেচনায় আনেন।

৯। প্রতিবন্ধী কয় প্রকার বা ধরনের হয়ে থাকে?[ম. বো. ২০২১]

ক. ৩ খ. ৪ গ. ৫ ঘ. ৬

[ঢা. বো. ২০১৬]

১০। উদ্দীপকে বর্ণিত শিক্ষিকার মত কাঙ্ক্ষিত আচরণ করলে-[ব. বো. ২০১৬]

i. প্রতিবন্ধীরা সমাজের অন্যদের মতো স্বাভাবিক জীবন-যাপন করতে পারবে

ii. প্রতিবন্ধীরা নিজেদের উপযুক্ত মানুষরূপে গড়তে পারবে

iii. প্রতিবন্ধীরা সমাজের জন্য কল্যাণকর ভূমিকা পালন করতে পারবে

নিচের কোন্টি সঠিক?

ক. i খ. ii গ. i ও ii ঘ. i, ii ও iii

THANK YOU

HSC
একাডেমিক কোর্স

পৌরনীতি ও সুশাসন ২য় পত্র

অধ্যায়ঃ ১০ – নাগরিক সমস্যা ও আমাদের করণীয়

টপিক – ০৮ সৃজনশীল প্রশ্ন সমাধান

রুনার বয়স ৬ বছর। তার আচরণ অন্য শিশুদের মতো স্বাভাবিক নয়। মা-বাবা তাকে খুব ভালোবাসে। রুনা কীভাবে সুস্থ হবে এ নিয়ে মা-বাবা চিন্তিত। মা রুনাকে ডাক্তারের কাছে নিয়ে জিজ্ঞেস করে, রুনা কোনোদিন সুস্থ হবে কিনা? মনে কষ্ট নিয়ে মা বললেন, কেন সৃষ্টিকর্তা তাদের ওপর এমন শাস্তি দিলেন। ডাক্তার রুনাকে দেখে, আদর করে তার মাকে বললেন, প্রতিবন্ধিত্ব কোনো অভিশাপ বা শাস্তি নয়। রুনাকে আদর-স্নেহ, ভালোবাসা দিলে এবং অন্য সুস্থ বাচ্চাদের সাথে মিশতে দিলে সে একদিন সুস্থ হয়ে ওঠবে।

[কু. বো. ২০২২]

প্রশ্ন :

ক. মন্ত্রিমিশন পরিকল্পনার সদস্য সংখ্যা কত জন ছিল?

খ. দুর্নীতি বলতে কী বোঝায়?

গ. "প্রতিবন্ধিত্ব কোনো অভিশাপ বা শাস্তি নয়"-এই উক্তিটি তোমার পাঠ্যপুস্তকের আলোকে ব্যাখ্যা করো।

ঘ. রুনার মতো শিশুদের স্বাভাবিক জীবনে ফিরিয়ে আনতে তোমার সুপারিশ কী কী?

মি. 'ক' স্বল্প বেতনের একজন চাকরিজীবী স্ত্রী। সন্তান নিয়ে কোনোরকমে সংসার চলে। মাত্র ২/৩ বছরের ব্যবধানে অদৃশ্য আয়ে মি. 'ক' গ্রামের কয়েক বিঘা জমির এবং ঢাকা শহরে বড় ২টি ফ্লাটের মালিক হলেন। মি. 'ক' স্বল্প আয়ে অল্প সময়ে অধিক সম্পদের মালিক হওয়া একটি প্রতিষ্ঠানের নজরে আসে। প্রতিষ্ঠানটি মি. 'ক' এর আয়ের উৎস অনুসন্ধান করে অবৈধ পথে অর্থ উপার্জনের সত্যতা পায়। প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তারা মি. 'ক' কে গ্রেপ্তার করে আদালতে সোপর্দ করে। আদালতে সাক্ষ্য প্রমাণে মি. 'ক' অপরাধী প্রমাণিত হয় এবং আদালত তাকে কারাদণ্ড ও অর্থদণ্ড উভয় দণ্ডে দণ্ডিত করে।

[কু. বো. ২০২২]

প্রশ্ন:

ক. দুদক কত সালে প্রতিষ্ঠিত হয়?

খ. বিশেষ চাহিদার জনগোষ্ঠী বলতে কী বোঝায়?

গ. উদ্দীপকে উল্লিখিত মি. 'ক' এর কর্মকাণ্ডে কোন ধরনের নাগরিক সমস্যা প্রকাশ পেয়েছে? ব্যাখ্যা করো।

ঘ. সুশাসন প্রতিষ্ঠায় উল্লিখিত প্রতিষ্ঠানটির ভূমিকা মূল্যায়ন করো।

রুমানা একাদশ শ্রেণির একজন ছাত্রী। বাড়ি হতে তার কলেজের দূরত্ব ৩ কি.মি.। পায়ে হেঁটে সে কলেজে যাতায়াত করে। কিছুদিন ধরে সে লক্ষ্য করছে কলেজে আসা-যাওয়ার পথে একটি ছেলে তাকে অনুসরণ করে এবং নানাভাবে শারীরিক অঙ্গভঙ্গি করে। একদিন ছেলেটিকে ডেকে এ ধরনের কাজ করার জন্য নিষেধ করে। এতে ছেলেটি ক্ষেপে গিয়ে তাকে অশ্লীল ভাষায় কথা বলে ও ভয়ভীতি দেখায়। রুমানা কলেজে এসে অধ্যক্ষ স্যারকে বিষয়টি জানালো। অধ্যক্ষ স্যার স্থানীয় প্রশাসনকে বিষয়টি অবহিত করলে নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট ভ্রাম্যমাণ আদালত বসিয়ে ছেলেটিকে এক বছরের কারাদণ্ডে দণ্ডিত করেন।

[কু. বো. ২০২২]

প্রশ্ন :

ক. PSC এর পূর্ণরূপ কী?

খ. খাদ্যে ভেজাল বলতে কী বোঝায়?

গ. উদ্দীপকের ঘটনাটি পাঠ্যবইয়ের যে ধরনের সমস্যার সাথে মিল রয়েছে তার কারণ ব্যাখ্যা করো।

ঘ. রুমানার সমস্যা সমাধানে তোমার সুপারিশমালা লিপিবদ্ধ করো।

THANK YOU